১২ বছরের প্রবাস - একাডেমিক জীবন থেকে ১২ টি অভিজ্ঞতা

অপর্ণা হাওলাদার, পিএইচডি
সহকারী অধ্যাপক ও গবেষক
অর্থনীতি,
চাথাম বিশ্ববিদ্যালয়
পীটসবার্গ, ইউএসএ
(2024)

Email: a.howlader@chatham.edu

পর্ব ১ঃ কমিউনিকেশনের প্রথম ধাপ ("আমার ইচ্ছা করে তোদের মতন মনের কথা কই")

সিরিজ আকারে লিখছি সুবিধার জন্য। ২০১১ সালে ঢাকা থেকে কানাডায় ভ্যাংকুভারে গিয়েছিলাম মাস্টার্স করতে। ২০১৩ তে প্রবাসজীবনের বারো বছর হোলো। কিছু অভিজ্ঞতা লিখে রাখতে শুরু করলাম সিরিজ লেখা। হয়তো নতুন যারা বাইরে আসবে ভাবছে, তাদের কাজে লাগতে পারে। কিংবা, কেবল গল্প হিসেবেই লিখলাম। সব কিছু কাজেই বা লাগতে হবে কেন!

আমি নেহায়েতই আপনাদের "পাশের বাড়ির মেয়েটা" সংজ্ঞাতে ছিলাম। "ভালো মেয়ে"র অনেক গুণই ছিলো আমার মাতৃপ্রদত্ত চরিত্র কাঠামোতে। মূলত, ঢাকা শহরের অন্য "ভালো মেয়ে"রা যেমন হয়, "ভালো মেয়ে"র সংজ্ঞা মেনে আমার জীবনযাপনের প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ছিলো শূন্য। সেই "শূন্য ভাণ্ডার" নিয়েই কেমন করে যেন বাইরে "পড়তে যাওয়ার" বিশাল সাহস করে ফেললাম। এও বলে রাখি - আমার চৌদ্দ গোষ্ঠীর কেউ আমেরিকা কানাডায় থাকে না। আপন মামাচাচা তো পরের কথা। তো, আমি আমার সাহসের উপর ভর করে প্লেনে তো উঠে বসলাম, তারপর?

অন্যসব পরে আসবে - টিকে থাকতে হলে বই এ যে কথাগুলো থাকে - হেনতেন ম্যানেজমেন্ট এবং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট - ইত্যাদির অনেক আগে মুখ খুলে স্বকন্ঠে কথা বলতে হয়। এক্সেন্টের লজ্জা ছেড়ে, ইংরেজির জড়তা ঠেলে - মানে, কথা বলা শুরু করতে হয়। আমি কি আসলেই জানতাম ঢাকা এয়ারপোর্টের পর আমি আর বাংলায় কথা বলতে পারবো না? আমাকে এই ভাঙা ইংরেজিতে বাক্যের পর বাক্য বলেই যেতে হবে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে? জানলে কি আমি জিআরই দিতে যেতাম? কে জানে!

আমাকেও হংকং এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করতে হোলো। পারি বা না পারি, সেই ইংরেজিতেই বলতে বলতে ঠেলেঠুলে এগিয়ে যাওয়া। কফিশপে ঢুকে কফির সাথে আমি বলি "ওয়ান স্পুন সুগার" - কেউ বোঝে না আমার "সুগার"। রেগেমেগে চা-কফিতে চিনিই খাওয়া ছেড়ে দিলাম। আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করা, একেবারেই বাঙ্গালি ঘরানার মধ্যবিত্ত ঘরে বড় হওয়া। আমাদের বাসায় ইংরেজি মুভি দেখার চল ছিলো না। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইংরেজি পত্রিকা, নভেল পড়ারও আমার অভ্যাস ছিলো না। এগুলো না করেও জিআরই, টোফেলে আমি আটকাইনি কারণ প্রচুর খেটেছিলাম ওইসব পরীক্ষার জন্য। আটকিয়েছি বাইরে এসে মূলত কি কথা বলবো তা নিয়ে। ইংরেজির যে জড়তা সেটা বাদ দিলেও কথা বলতে টপিক লাগে একটা র‍্যান্ডম মানুষের সাথে। অচেনা মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে এই টপিক আমি কোথায় পাবো?

কিছু মজার কথা বলেই শুরু করি। আমার ফুল ফান্ডিং ছিলো মাস্টার্সে টিচিং এসিস্টেন্টশিপ থেকে। ফুল ফান্ডিং এর খুশিতে, গর্বে ভুলে গিয়েছিলাম যে গিয়েই দুই সপ্তাহের মধ্যে আমার পুরো একটা ক্লাসে ঢুকে বিদেশি ছাত্রদের ইকনমিক্স পড়াতে হবে!

তো, আমি আবার মাতবরি করে টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপে থার্ড ইয়ার লেভেলের ইন্টারমিডিয়েট মাইক্রোইকনমিক্স ক্লাস দিয়েছিলাম। ঢাবিতে জুনিয়রদের ব্যাচে পড়াতাম, তাই মনে হয়েছিলো এটাই ভালো হবে। ভ্যাংকুভারে পৌঁছে টিএশিপের সুপারভাইজারের সাথে মিটিং হোলো। অল্পবয়সী ছেলে - আমেরিকান; নতুন পিএইচডি করে জয়েন করেছে। ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার স্কেজুয়াল কি?" আমি তো এই শব্দ জীবনে কোনোদিন শুনি না। স্যরি স্যরি বললাম কিছুক্ষণ, ও বলতেই থাকলো। ব্রিটিশ শিডিউল যে আমেরিকায় "স্কেজুয়াল" এটা তো আমি জানার কারণ ছিলো না।

ক্লাসে পড়া ফলো করতে কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম ঝামেলা হয়েছে। কারণ, ইকনমিক্সে কিছু সুবিধা আছে। প্রথমদিকে সব ক্লাসই টেকনিক্যাল ছিলো। মাইক্রো, ম্যাক্রো, ইকনমেট্রিক্সের মত ক্লাসে তো ভাবপ্রকাশের জন্য ইংরেজি কেউ বলে না। তাই ক্লাসে বুঝতে সমস্যা হোতো না, কিন্তু ঝামেলাটা হোতো দুইটা ব্যাপারে। ইংরেজির কিছুটা জড়তা, কিছুটা লজ্জার কারণে ক্লাসে প্রশ্ন করতাম না। ক্লাসে প্রশ্ন করা শিখেছি সহপাঠীদের কাছে। বুঝেছি ধীরে ধীরে যে ক্লাসে প্রশ্ন না করলে শিক্ষকেরা আগ্রহ নেই বলে মনে করে। এটা পরে অনেক এফেক্ট করে - মূলত পিএইচডির এপ্লিকেশনের জন্য। আমি নিজে শিক্ষক হিসেবেও জানি, যে ছাত্র প্রশ্ন করে না - তাকে মনে থাকে না তেমন।

এই তো গেলো ক্লাসের কথা, এর বাইরেও তো একটা জায়গায় গেলে মানুষের সাথে কথা হয়। প্রতিবেশির সাথে কথা বলতে হয়, রাস্তায় হাই হ্যালো করতে হয়। যেটাকে "চিপ টক" বলে আর কি! এ নিয়ে আরেক সমস্যা। এক তো আমি এক ইন্সিকিউরড বাঙ্গালি মেয়ে, মুখ খুললেই দেশে সহপাঠীরা "বুলিয়িং"ই করেছে সবসময়, তার উপর আমি আবার কমন টপিকই খুঁজে পাই না। কি নিয়ে কথা বলবো? আমাদের তো দেশে অপরিচিত মানুষের সাথে কথা বলার নিয়ম নেই। প্রথম সেমিস্টারে একদিন ভোরবেলা আমার বাসা থেকে বের হয়ে বাস স্টেশনে যাচ্ছি। পাশের বাড়ির এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা গার্ডেনিং করছিলেন। উনি তাকিয়ে হাসলেন। হাসতে তো কথা বলা লাগে না, আমিও হাসলাম। উনি বললেন, "তুমি জানো তোমার হাসিটা কি সুন্দর"। আমি জানি কি জানি না, এটা বড় কথা না - আমি হঠাত আবিষ্কার করলাম, এই দুনিয়ায় দুইজন মানুষের কথা বলতে তেমন কোনো কষ্ট নেই আসলে। খুব সাধারণ কাইন্ডনেস কারো দিনটা বদলে দিতে পারে। সেই থেকে আজো আমি চেষ্টা করি মানুষকে কিছু একটা নিয়ে ভালো একটা কথা বলতে হঠাত দেখা হলে। একটু সাধারণ প্রশংসার মত চমৎকার "চিপ টক" আর কিছুই নেই!

এর বাইরে যেটা জরুরি ছিলো, যেটা বুঝতেও সময় লেগেছে - অনেক প্রফেসর এবং সহপাঠীর সাহায্য ছিলো - সেটা হোলো প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক বানানো। এই বলতে যে একটা জিনিস আছে, তাই তো জানতাম না। দেশে স্যারদের "তেলানি"র নিয়ম ছিলো, হেঁহেঁ হাসির ব্যাপার ছিলো, তিনবার সালামের ব্যাপার ছিলো - কিন্তু প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং এর কালচার তো ছিলো না। যেহেতু প্রফেশনাল নেটওয়ার্কে চিপ টক আমি জানতাম না, মূলত শিখেছি আশেপাশের মানুষের থেকে। পরে বই পড়েছি, কিন্তু শুরু করেছি আমি সেমিনারে, কনফারেন্সে মানুষ অবজার্ভ করেই। মানুষকে দেখি, সেখান থেকে পিক করার চেষ্টা করি। একটা গল্প বলি। একটা কনফারেন্সে আলাপ হোলো সমবয়সী কিছু ছেলেমেয়ের সাথে। আমরা একটা টেবিলে বসলাম একত্রে। ওই সাবজেক্টের এক নামকরা প্রফেসর আসলেন। আমার পাশে বসা ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো এক সময় কথা চালাতে, "তোমার এখনকার কোন প্রজেক্টটা নিয়ে তুমি খুব এক্সাইটেড?"। প্রশ্নটা এমন আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে আমি প্রচণ্ড অবাক হলাম এবং খুব আনন্দ পেলাম। কেউ অন্যের কাজ নিয়ে জেনুইন আগ্রহ দেখাচ্ছে, এর চেয়ে সুন্দর আসলে কিছুই হয় না। এই ছেলেটাই আবার আমার প্রেজেন্টেশনের পর আমাকে যা যা প্রশ্ন করা হয়েছে, তা ইমেইল করে পাঠালো। ওকে আমি বলিনি কাজটা করতে, ও নিজেই করেছে - নতুন সব বন্ধুদের জন্য। অন্যের গবেষণায় এই সাহায্যটাই ওর আনন্দ। ছেলেটা এখন টরেন্টো ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক, বড় বড় জার্নালে পাবলিশ করছে। দেখা হয়, এখনো আগের মতই আছে।

কিছু উচ্চারণের ঝামেলা আমার সারাজীবনই থাকবে, কিন্তু ক্লাসে পড়াই যেহেতু মোটামুটি চালিয়ে নেওয়ার মত কমিউনিকেশন স্কিল তো তৈরি হয়েছে। সেটা কিভাবে? আমার ধারণা এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে, আমি একা ছিলাম এবং বাংলাদেশি কমিউনিটি পছন্দ করতাম না। পছন্দ কেন করতাম না, তা নিয়ে পরে একদিন কথা হবে। আমি আবার প্রচণ্ড কিউরিয়াসও ছিলাম অন্য কালচারের মানুষ সম্বন্ধে জানতে। এতে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মূলত অন্যদেশের মানুষই হয়। এবং, আমি এমন কিছু মানুষের পড়ার স্টাইল, রিসার্চের আগ্রহ, একাডেমিক এম্বিশন দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। আমরা মূলত একটা গ্রুপ এভাবে প্রায় সারাদিন একত্রে থাকা শুরু করি - পড়াশোনা করি, প্ল্যান করি,

হাবিজাবিও করি। এটাই মূলত ২৪ ঘন্টা ইংরেজিতে কমিউনিকেশনে বাধ্য করে। আর বন্ধু বাড়লে কথা বলার টপিকও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আপনি অবজার্ভ করলে জানবেন কিভাবে কথা বলতে হয়, কি কথা শুনতে ভালো লাগে। এক্সপোজারের চেয়ে বড় পাঠশালা কিছু নেই।

কি কথা বলা যায়, কি বলা যায় না - এটা শেখার জীবনে কোনো বিকল্প নেই। পেশাগত জীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনে - সব জায়গাতেই।

পর্ব ২ঃ কমিউনিকেশন ২ - অ্যাটিটিউড (Attitude) "বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার প্রাণ"

ইংরেজির জড়তা নিয়ে কথা হচ্ছিলো। লজ্জা ঝেড়ে যে মুখটা চালাতেই হয়, সেটাই কিছু গল্প করছিলাম। এটাও বলেছি যে ঝামেলা কিছু থাকবেই - আমি আমার জীবনে আমেরিকান এক্সেন্টে ইংরেজি বলতে পারবো না, বললেও খুবই নকল শোনাবে। কিন্তু তাতে আমার সমস্যা হচ্ছে না কোনো। আমি আমেরিকান ইকনমিক হিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করি - এতটাই "আমেরিকান" আমার গবেষণার বিষয়, তাও আমার ইংরেজি দিয়ে চালানো তো যাচ্ছে! সিরিজের একেবারে শেষদিকে আমি কিছু টিপস/ট্রিক্স শেয়ার করবো এসব নিয়ে। আপাতত, গল্পই এগোক।

কমিউনিকেশনের মূল কথা কিছু ভোকাবুলারি বা ইংলিশ স্কিল না। কমিউনিকেশনের মূল কথা আমি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি হচ্ছে Attitude - এখন এর বাংলা করতে গেলে ভঙ্গি বলা যায়, কথা বলার ঢং ইত্যাদিও বলা যায়। এই শব্দটার ভালো একটা বাংলা মাথায় আসছে না। তাই Attitude ধরেই এগোচ্ছি।

আমার অ্যাটিটিউড কি ছিলো? মানুষের প্রতি? নিজের প্রতি? জীবনের প্রতি? এই নিয়েই কিছু সাধারণ গল্প হোক।

২৫ বছরে দেশ ছেড়েছিলাম। তার আগে পর্যন্ত আমি বড় হয়েছি মূলত টিটকারি শুনে। ভালো করলেও লোকে খারাপ বলতো, খারাপ করলে তো কথাই নেই। আমি মিথ্যা বলবো না - আমি আগাগোড়া "মানুষ" ভয় পেতাম। এবং, ভয় যে পেতাম এটা জানতামও না। শৈশব থেকে "মানুষ" এড়িয়ে যাওয়া আমার প্রায় সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হয়ে ছিলো। কারো সাথে কথা বললে সে আমাকে টিটকারি মেরে দুইটা কথা বলবে। হাসাহাসি করবে। আরো ঝামেলা হবে। শিক্ষকদের প্রশ্ন করলে বাজে ব্যবহার করবেন। কাউকে কিছু বললেই বাজেই ব্যবহার করবে, এটাই আমার জীবনের মূল Attitude ছিলো। এটা তৈরির পেছনে কার কত ভূমিকা ছিলো, সেই গবেষণায় আমি যাচ্ছি না। আমি বরং বলতে চাই এই গল্পটা যেখানে আমি ধীরে ধীরে এই জীবনদর্শন থেকে বের হয়ে আসতে শিখেছি।

আমি শুরুটা একেবারেই ক্লাসরুম থেকে করতে চাচ্ছি কারণ দেশের বাইরে গেলে পর প্রথম গ্র্যাজুয়েট ছাত্র হিসেবে আসলে এরাই আমাদের কমিউনিটি। আমার ২৫ বছরের জীবনের "মানুষ"ভীতি থেকে বের হয়ে আমি প্রথম আসলেই একটা কমিউনিটি, বন্ধু গ্রুপ তৈরি করতে পেরেছিলাম মাস্টার্সে গিয়ে - এবং, এই বন্ধু গ্রুপটাই আমার Attitude পরিবর্তনের মূল কারণ।

বাংলাদেশে আপনি অনার্স মাস্টার্সের কথা চিন্তা করুন। দুইজন ছাত্র কিভাবে কথা বলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে? নারী শিক্ষার্থীদের সাথে কি কথা বলে? বুলিয়িং আমাদের প্রায় প্রতিদিনের ক্লাস কালচার। সেটা সেক্সুয়াল হোক, বডি শেইমিং হোক বা মফস্বলের এক্সেন্ট নিয়ে হোক। প্রায় সব কিছু নিয়ে বুলিয়িং করেই আমরা "মজা" পাই। আমার ভেতরে খুব অবচেতনেই তাই মানুষের কাছে "বুলিয়িং"টা আসবেই ধরা ছিলো।

সাইকোলজিক্যাল ভাবে চিন্তা করলে আমার মত মানুষ যারা অনেক কথা শুনে বড় হয়েছে, তারা অনেকক্ষেত্রেই প্রচণ্ড প্যাসিভ এগ্রেসিভও হয়। নিজের কথা ঠিকঠাক বলতে পারে না। অন্যের কথা না বুঝে প্রথমেই নেগেটিভ অর্থ বার করে। পরিষ্কার করে জানতে চায় না। জানালে বুঝতে চায় না। রিএক্ট করে কিন্তু একশন নিতে পারে না। এই একটা কিছুই কিন্তু প্রফেশনালি ভালো কথা না। আমি বাড়িয়েকমিয়ে বলছি না, এই ধরণের মানুষদের সেলফ স্যাবোটেজের ভীষণ প্রবণতা থাকে। সেলফ স্যাবোটেজের ভীষণ প্রবণতা আমারো ছিলো। আমাকে কেউ কিছুতে সাহায্য করবে না - এর চেয়ে ভয়ংকর এটিটুড জীবনে আর কিছুই হতে পারে না।

তো, এই বুলিয়িং কালচার দেখে বড় হওয়া আমি প্রথমদিন ক্লাসে গেলাম আমার নিউ মার্কেট থেকে কেনা ব্যাকপ্যাক, আর বড় একটা চায়ের থার্মোফ্ল্যাক্স ইত্যাদি নিয়ে। দুই নাম্বার বেঞ্চে বসলাম। এক নাম্বার বেঞ্চে বসা দুইটি চাইনিজ ছেলেমেয়ে পেছনে ফিরলো খুব হাসিখুশি মুখ নিয়ে। জানতে চাইলো, নাম কি? আমরা পরস্পরের নাম বিনিময় করে প্রত্যেকেই যে কারো নাম ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারছি না এটা দেখে হাসতে হাসতে শেষ হয়ে গেলাম। আমার জীবনে এই প্রথমদিন যেখানে আমি মানুষকে একেবারেই বুলিয়িং ছাড়া "মজা" করতে দেখেছি। নিজেকে নিয়েই মজা করতে দেখেছি।

এরপর এভাবেই কয়েকজন মিলে এসাইনমেন্ট, পড়াশোনা, পরবর্তী পিএইচডি প্ল্যান করতে গিয়ে আমি ধীরে ধীরে দেখলাম আমার "মানুষ" আর ভয় লাগছে না। আমি পড়াশোনার ব্যাপারে আলোচনা করতে পারছি, ঘুরতে যেতে পারছি হাইকিং এ, এদিকওদিক খুঁজে সস্তা রেস্টুরেন্টের খোঁজ নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছি - সারারাত এসাইনমেন্ট করতে অফিসে থাকতে পারছি। উইকেন্ডে ওদের সাথে হটপট বানাচ্ছি। হটপটের মধ্যে ওরা নিজেরাই আমার জন্য চিকেন, ল্যাম্ব বেছে দিচ্ছে কারণ শুনেছে আমি বিফ/পর্ক খাই না। আমি অবাক হই, বিদেশবিভূই এ একা মানুষের কাইন্ডনেস দেখে চোখে জল চলে আসে। সাথে কিছু এম্বিসাস, ফোকাসড মানুষের সাহচর্য থাকা জীবন কতটা পালটে দেয় - আমি তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। আমার এই বন্ধুরা এখন সবাই পিএইচডি শেষ করেছে, ভালো করছে সবাইই - এখনো যোগাযোগ আছে ঠিকই।

এত যে আমরা একত্রে পড়াশোনা করতাম, কেউ কিন্তু কাউকে "কত পাইছো" বলে পেছনে ঘুরতো না। পরীক্ষা কেমন হয়েছে? শেষ - এটাই প্রশ্ন। হায়েস্ট আর এভারেজ জানা থাকলেই ক্লাসে নিজের অবস্থান বোঝা যায়। এর বাইরে এক্সাক্টলি কে কত পেয়েছে, ডিটেইলস আর কারো যে জানার দরকারই নেই - আমি এটাও দেখলাম ধীরে ধীরে। পরীক্ষার রেজাল্ট একটা প্রাইভেট ইনফরমেশন, এটা শেয়ার করতে কেউ না চাইলে তাকে বাধ্য করাটা অন্যায়। বুঝতে পারলে আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবন কত অন্যরকম হোতো, চিন্তা করুন! ঢাবিতে আমার ডিপার্টমেন্ট দেওয়ালে রেজাল্ট টাঙ্গিয়ে দেয় নামসহ। কী বীভৎস!

আমার সাইকোলজিক্যাল attitude এ মূল সমস্যা শুরু হয় শিক্ষকদের সাথে কানেকশন তৈরিতে। আমার সাথে অন্য যে ছেলেমেয়েগুলো ছিলো, তারা নির্দ্বিধায় শিক্ষকদের অফিস আওয়ারে যাচ্ছে। কথা বলছে, কোনো ভুল হলেই গিয়ে দেখে আসছে পরে কিভাবে ভালো করবে। আমি ভয়েই যেতে পারছি না। শিক্ষক ইমেইলে দেরি করলেই মাথায় ঢুকে বসে আছে যে আমিই নিশ্চয়ই এতই খারাপ যে উনি কেয়ার করছেন না। শিক্ষকেরা ভালো ব্যবহার করেন, আমি আতংক নিয়ে ঘুরে বেড়াই। আমি জানি যে আমার পিএইচডি এপ্লাই করতে লেটার লাগবে। এখানে শিক্ষকদের সাথে কানেকশন তৈরি করতে হবে, কিন্তু আমি আতংকেই কাজ করি না তা নিয়ে। আমার বন্ধুরা গিয়ে কথাটথা বলে ভলান্টিয়ারিলি রিসার্চ এসিস্ট্যান্টশিপও পেয়ে যায়। আমাকে বারবার সাজেশন দেয় গিয়ে কথা বলতে। আমি আতংকে থাকি। দিন কেটে যায়!

মূল কথা হচ্ছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আমার একেবারেই শূন্যের কোঠায় ছিলো। এটা থেকে বের না হতে পারলে আমি হয়তো কোনদিকেই যেতাম না। এরপর আমি জোর করে ধীরে ধীরে প্রথমে অন্য ক্লাসমেটদের সাথে এবং পরে একা শিক্ষকদের অফিস আওয়ারে যাওয়া শুরু করি। ওদের মত করে গুছিয়ে আমার কি লাগবে, সেটা জানাতে না পারলেও - কেবল এক্সিস্টেন্সের কারণেও আমার মধ্যে পজিটিভ পরিবর্তন আসে। আমি দেখি যে আমার একেবারেই কম্পিটিটিভ বন্ধুরা সাহায্য করতে কেউ পিছপা হয় না। ট্র্যাশিং ছাড়া - আমরা সবাই মিলেই ভালো করতে পারি, এটাও একটা জীবনের attitude। একত্রে শিখতে পারি - এটাই পড়াশোনাকে আনন্দময় করে।

আমি এটাও দেখি যে আমি খুব খারাপ রেজাল্ট করলেও শিক্ষকেরা সাহায্যই করতে চান। খারাপ রেজাল্ট নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। খারাপ রেজাল্ট নিয়ে লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে থাকলে বরং ভবিষ্যতেও যে খারাপই হবে, এটাই ঠিক করে দেওয়া হয়। কমিউনিকেশনের আরেক বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে টিচেবল হওয়া। এটা কিভাবে যেন আমার ভেতরে ছিলো। মানুষের কাছে থেকে শিখেছি স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা, প্ল্যান অনুযায়ী আগানো। কাউকে ভুল সাজেশনের কারণে দোষ দেওয়ার কিছু নেই, মানুষ তার নিজের জায়গা থেকে সাজেশন দেয়। কেউ সময় নিয়ে সাজেশন দিচ্ছে, এটাই বড় কথা!

খুব ভীতু, ইন্ট্রোভার্ট, আতংকগ্রস্থ একটা মেয়ের মধ্যে কেবল আশেপাশের মানুষের attitude আকাশপাতাল পরিবর্তন করে দেয়। অবাকই লাগে চিন্তা করলে এখন!

পর্ব ৩ঃ **Being Strategic ("ছলে, বলে ও কৌশলে")**

ইংরেজিতে কথা বলে, অন্যদের এক্সেন্ট বুঝে একটু উতরানোর আগেই শুরু হয় বিভিন্ন ক্লাসে এসাইনমেন্টের বর্ষা। একের পর এক ডেডলাইন। একটা শেষের আগেই আরেকটা চলে এসেছে। দিনে দুইটা এসাইনমেন্ট ডিউ। প্রজেক্ট প্রপোজাল ডিউ। পেপার লিখে প্রেজেন্ট করতে হবে - সেটাও ভীতিকর। আমি তো কোনোদিন কিছুই প্রেজেন্ট করিনি।

বলাই বাহুল্য, এত ডেডলাইন দেখে আমার ব্রেইন প্রস্তুত ছিলো না। ঢাবিতে আমি যে বিভাগে পড়তাম, তাতে বছর শেষে একটা পরীক্ষা হোতো। মাঝে দুইবার হয়তো ইনকোর্স এক্সাম ছিলো। পরীক্ষার আগে তিন/চার সপ্তাহ আমাদের বন্ধ থাকতো। আর এখানে কিনা ক্লাস শেষের পর পরীক্ষা দিতে যেতে হয়। আবার, একই দিনে একাধিক পরীক্ষাও থাকে।

তো, এসাইনমেন্ট একটু বুঝতে না বুঝতেই কয়েক সপ্তাহে শুরু হয় মিডটার্ম। যেহেতু আমি পিএইচডিতে এপ্লাই করার স্টেপ হিসেবেই সাইমন ফ্রেজারে মাস্টার্স করতে গিয়েছিলাম, আমার কাছে এই পরীক্ষাগুলোতে ভালো করাটা প্রচণ্ড দরকার ছিলো। অথচ প্রশ্নই এত টেকনিক্যাল, এত বেশি ম্যাথ এবং স্ট্যাট - যা আমি প্রায় কিছুই বুঝি না। পরীক্ষায় ভালো করা তো অনেক দূরের কথা।

তার সাথে আরও আছে পড়াশোনার স্টাইল। পড়াশোনার স্টাইল নির্ভর করে পরীক্ষা পদ্ধতির উপর। দেশে আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি ছিলো মুখস্থনির্ভর - অনার্সেও আমাদের প্রশ্ন আসতো বই থেকে হুবহু। মোটামুটি ক্লাস করলে, বই পড়লেই হয়ে যেতো। সারা জীবনের এই পাঠ্যপুস্তক আদি- অন্ত পড়ে যাওয়ার অভ্যাস আমার মনের মধ্যে গেঁথে ছিলো। আমি সব বই পড়ে, লেকচার দেখে একটুআধটু সময় পেলে কিছু প্রাকটিস প্রশ্ন দেখি। প্রশ্ন কিভাবে সলভ করতে হয়, এটা নিয়ে আমার তখন আইডিয়া প্রায় শূন্য। আমি দেশীয় "ভালো ছাত্র" স্টাইলে অনেক পড়াশোনা করেই যাই। কিন্তু পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখি প্রশ্ন আগামাথা কিছুই বুঝি না। প্রথম মিডটার্মটা ছিলো ইকনমেট্রিক্স-১ এর। সেই মিডটার্মে পাতার পর পাতা বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্ন বুঝে কি চেয়েছে সেই পর্যন্তই আমার মাথায় আসে না। আমি কিছুক্ষণ এটাওটা করে খাতার সামনে বসে থাকি। প্রায় শূন্য খাতা জমা দিয়ে আসি।

এরা আবার দুই দিনের মধ্যেই পরীক্ষার খাতা ফেরত দিয়ে দেয়। আবার, খাতা কেবল ফেরত দেয় না - সেটা ফেরত নেয় না আর। এটাও আমার কালচারাল শক। ঢাবি পাঁচ বছরে আমার একটা পরীক্ষার খাতা ফেরত দেয়নি। জানিই নাই কোনোদিন কোথায় কি ভুল হয়েছে। তো, যা হবার তাই হোলো - আমি খুব বাজে করলাম এই পরীক্ষাতে। কয়েক নাম্বার যা দিয়েছে ওটাও "পার্শিয়াল মার্ক" ধরে, আমি নিজে তো মূলত কিছুই লিখিনি।

আমি আশেপাশে দেখি আমার বন্ধুরাই ১০০ তে ১০০/ ৯৫/৯৬ পাচ্ছে। ওদের সাথে কথা বলতে গেলে পড়াশোনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমার তেমন সমস্যা হয় না, কিন্তু ওরা যেভাবে প্রবলেম সলভ করতে পারে - সেটা আমি পারি না। তো সমস্যার সমাধান একটাই ছিলো - অনেক অনেক প্রবলেম ধরে ধরে সল্ভ করা। মূল বই পড়ার অভ্যাস আমার ভেতর এত গেঁথে আছে সেটা বাদ দেওয়া সম্ভব না। শুধু মূল বিষয় দেখে সরাসরি প্রবলেমে চলে যেতে আমার কষ্ট হয় - তাই, আমি মূল বই আগেই পড়ে এরপর এদিকওদিক থেকে যত পারি প্রশ্ন বের করা শুরু করলাম। চাইনিজ নেটওয়ার্কটা থাকায় আমার অনেক কাজে লাগে, ওরা সিনিয়র চাইনিজ ছেলেমেয়েদের থেকে সব প্রশ্ন এনে রাখতো। ওগুলো আমাকে দিলো, আমি দিনরাত নতুন স্ট্র্যাটেজিতে মানানোর চেষ্টা শুরু করলাম। ঘন্টা ধরে প্রশ্ন উত্তর দেই, পরে চেক করি।

যারা বাইরে পড়তে আসছে, তাদের জন্য এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যতই পড়াশোনার অনুরাগী হন, আপনার যতই পড়াশোনা ভালো লাগে না কেন - অন্য দেশের সিস্টেম বুঝে সেই মোতাবেক নিজের স্ট্র্যাটেজি বানাতে না পারলে ঝামেলা হবে। আপনি ধীরে ধীরে ফ্রাস্টেটেড হয়ে হাল ছেড়ে দেবেন। বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য এটা মহাসত্য। কেন? কারণ, বাংলাদেশে স্যোশাল সায়েন্সে পড়াশোনার মান বৈশ্বিক বিবেচনায় প্রচণ্ড খারাপ। আমার পাঁচ বছরের ঢাবি জীবনে একটা থিসিস লিখতে হয় নি, গ্রুপ প্রজেক্ট করতে হয় নি। আর বাইরে এসে প্রতিটা ফিল্ড কোর্সে আলাদা আলাদা আইডিয়া নিয়ে পেপার লিখতে বলছে। সেটা আবার ইংরেজিতে ক্লাসের সামনে গিয়ে স্লাইড বানিয়ে প্রেজেন্টও করতে হয়েছে। এতটা বদল কেবলমাত্র স্ট্র্যাটেজিক হলেই সম্ভব। আমার ভালো বন্ধু গ্রুপ ছিলো যারা প্রচণ্ড একাডেমিক মাইন্ডেড, ভালো করতে চায় - খাটতে পারে, যেটা আমাকে অবশ্যই অনেক

সাহায্য করেছে। কিন্তু মূল বোঝাপড়াটা তো নিজের সাথেই। এমন অবস্থায় প্রাথমিক ফ্রাস্টেশন ঝেড়ে ফেলাটা সহজ নয়।

মূলত অন্যদের সাথে কথা বলে বুঝতে হবে গ্যাপগুলো কই। আমি কি করছি, অন্যরা কি করছে - প্রশ্ন কেমন আসছে, এর সাথে আমি মানাতে পারছি না কেন। গ্যাপগুলো বুঝলেই কেবল ধীরে ধীরে পরিবর্তন সম্ভব। এই পরিবর্তন আনতে আসলে কয়েক মাসের বেশি সময় লাগে না। আমার ফার্স্ট সেমিস্টারে সিজিপিএ ৩.২৫ ছিলো, দ্বিতীয় সেমিস্টারে ৪ আউট অফ ৪ ই ছিলো। গ্যাপ একবার বুঝতে পারলে সেটা কমানোর চেষ্টা করলে কাজটা একটা সময় খুব ইন্টারেস্টিং হয়ে যায়। কারণ, সত্য হচ্ছে, এখানে যেভাবে ক্রিয়েটিভ, ইন্টিউটিভ প্রশ্ন করে - ওগুলো উত্তর বের করতেও মজা লাগে। এই মজাটা তখনই পাওয়া সম্ভব যখন ভয়টা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

কেবল কিন্তু পরীক্ষা, পেপার প্রেজেন্টেশন এগুলোই না - আমার একই সাথে একটা খুব ডিমান্ডিং টিচিং এসিস্টেন্টশিপ ছিলো যার সুপারভাইজার ছিলেন নতুন। কোনো ধরণের সাহায্য করতে অপারগ, বা আদৌ করতে চান না। আর ছিলেন একজন কো-টিএ যিনি খুব সিনিয়র একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট। বোকা পেয়ে ওই সময় অনেক এক্সট্রা করিয়ে নিয়েছে আমাকে দিয়ে। যেটা আমি সিস্টেম বুঝলে হোতো না।

ভালো যায়নি ফার্স্ট সেমিস্টার সব মিলিয়ে। তবে, আমাকে অনেক পাল্টেছে। অতটা খারাপ পরিস্থিতিতে আমি আর যাইনি ক্লাস, এক্সাম, টিএশিপ নিয়ে। কারণ, সেকেন্ড সেমিস্টারের মধ্যেই আমি নিজেই প্রায় পুরোটাই চেইঞ্জ হয়ে গিয়েছিলাম। এই ধরণের স্ট্রাকচারাল চেইঞ্জের সময়গুলো জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আমার কোনোদিনই এমন হয়নি যে প্রশ্নই বুঝতে পারছি না।

শেষ করি একটা মজার গল্প দিয়ে। আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে গত বছর "ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট" কোর্সটা পড়িয়েছি। একটা টেকনিক্যাল কোর্স, একই সাথে বেসিক প্রোগ্রামিং, ডাটা এনালাইসিস, অনেক পেপার পড়া, নিজের আইডিয়া বের করা, প্রেজেন্ট করা - খুব কঠিন একটা ক্লাস। আমার ছাত্ররাও অনেক মজা পেয়েছে কারণ ক্লাসটাতে আসলেই অনেক কিছু শেখার আছে -ইন্টেলেকচুয়ালি ডিমান্ডিং একটা ক্লাস।

অন্যদিকে, এই ক্লাসটা আমি নিজে ঢাবিতে পড়েছিলাম। স্যার আসতেন না। দুইচারদিন যা এসেছেন, কিছু পড়াননি। আমি তাই আমাদের সিনিয়র এক খুব ভালো ছাত্রের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কিভাবে ভালো করবো এই পরীক্ষায়। উনি আমাকে বললেন, অনেক অনেক লিখতে হবে। অনেক পেইজ লিখলে স্যার অনেক নাম্বার দিবেন। কয়েকটা কালি ব্যবহার করে, সুন্দর পয়েন্ট করে লিখলে অনেক নাম্বার দিবেন। তো, এগুলো মেনে নিয়ে, অনেক অনেক রচনা লিখে আমি ওই ক্লাসে হায়েস্ট পেয়েছিলাম।

এই হোলো অবস্থা! এখন আমার ছাত্রদের ট্রেইনিং নিয়ে যারা গ্র্যাজুয়েট স্কুলে যায়, আর আমার অবস্থা থেকে যারা আসে - তাদের ইনিশিয়াল অবস্থা এক হবে না। এই গ্যাপগুলো বুঝতে হবে - বুঝলে কাভার করা তেমন কঠিন না। কারণ, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা অনেক খারাপ, কিন্তু আমরা অনেকেই প্রচণ্ড কম্পিটিশনে টিকে থাকার মেজাজে বড় হয়েছি। হাল ছেড়ে দেওয়াটা আমাদের অনেকের অভ্যাসে নেই। দেশের বাইরে যাওয়ার আগে আমাকে ঢাবিতে "স্যার" বলেছিলেন "মেয়েরা বাইরে গেলে পারে না, তোমার যাওয়ার দরকার নেই। তোমরা ফেল করো আর আমাদের বদনাম হয়।" উনি আরও বলেছিলেন, "এখন তোমার বিয়ের বয়স। পড়াশোনা হবে না তোমাকে দিয়ে।"

সেই স্যারও অনেক উপকার করেছেন। না পেরে "স্যার" এর বাণী সত্য করার বাসনা আমার ছিলো না।

পর্ব ৪: Conflict Resolution (সংঘাত - সমাধান - সংকল্প)

ম্যাচিউরিটি শব্দটাকে অনেকে অনেকভাবে ডিফাইন করতে পারে। আমার কাছে মনে হয় ম্যাচিউরড হয়ে ওঠার একটা বড় অংশই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এবং কনফ্লিক্ট রেজোল্যুশন। কোন সময় কি সম্পূর্ণ ইগনোর করতে হবে,

কোন লড়াইটা লড়তে হবে; আমার লিমিটেড এনার্জি কি ব্যাপারে খরচ করবো? কোথায় নিজের জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে? কিভাবে দাঁড়াতে হবে?

নিজের জন্য দাঁড়ানোর বাঙ্গালি একটা তরিকা আছে যেটা ভিলেজ কমিউনিটি থেকে আসা - হয় কেঁদেকেটে ভাসিয়ে দেওয়া অথবা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা, মুখ দেখাদেখি বন্ধ করা। কনফ্লিক্টের সামনে আমরা এই দুই প্রকারের মানুষই বেশি দেখি দেশী কালচারে। কিন্তু প্রফেশনালি উন্নতির জন্য, প্রবাসে একাডেমিয়ায় টিকে থাকার জন্য আমাকে ধীরে ধীরে বুঝতে হয়েছে প্রফেশনালি কনফ্লিক্ট কিভাবে সামাল দেবো। সেটা নিয়েই আজকে কিছু আলোচনা/গল্প করতে চাইছি।

আমি বা আমরা অনেকেই প্রায় বন্ধ ঘরে বড় হয়েছি। অনার্স, মাস্টার্সে পড়ার সময়েও বিকেলের আগে বাসায় আসতে হোতো। ঢাকার বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। পার্টটাইম চাকরি হিসেবে কেবল রিসার্চ ইন্টার্নশিপ বা টিউশনি করা যেতো। স্কুলকলেজের বাইরে আমাদের তেমন সার্কেল ছিলো না। এই ধরণের এক্সপেরিয়েন্সে বড় হলে ২৫ বছর বয়স হলেও বৈশ্বিক বিচারে আমাদের আসলে বয়স থাকে ১৭/১৮। কেন বলছি? উদাহরণ দেই।

আমি ঢাবি থেকে বের হয়ে ২০১০ সালে, এরপর জিআরই পরীক্ষা দেওয়ার সময় একটা চাকরি করতাম। ৬ মাসের রিসার্চ এসিস্ট্যান্টশিপ। এমন একজন অর্থনীতিবিদের আন্ডারে যিনি অনেক বড় ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা শেষ করে মাত্র দেশে এসেছেন। এবং, উনি নিজেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কাজ করবো কিনা জানতে চেয়ে। সেই একই চাকরিতে অফিসে কিছু পুরুষ ছিলেন যারা আমার সুপারভাইজার না, কিন্তু ওনারা অনেক টক্সিক ছিলেন। মিথ্যাও বলতেন অনেক। এবং, জিআরই দিচ্ছি বাইরে এপ্লাই করেছি, ফান্ডিং পেয়েছি এই প্রতিটা স্টেপে অনেক বুলিয়িং করতেন। এরা মূলত মধ্যবয়সী মিডিওকার পুরুষ যাদের নিজেদের জীবনে কোনো এম্বিশন নেই, আনন্দ নেই। অনেকগুলো অল্পবয়সী মেয়ে ছিলো ওইসময় আমার সেই অফিসে। মেয়েদের কারো সাথেই ওনারা ভালো ব্যবহার করতেন না - মেন্টরিং তো অনেক পরের কথা। রিসার্চের কিছুই শিখিনি ওই ছয় মাসে, তবে বাংলাদেশের অফিসে পুরুষদের চৌদ্দ রূপ দেখা হয়ে গিয়েছে।

তো? আমার বয়স তখন ২৪/২৫। এই বয়সে প্রফেশনাল পরিবেশে এই ব্যবহারের উত্তরে আমি কি করেছি?

ঠিক ধরেছেন - কিছুই করিনি। অপমান করেছে, অপমান সয়ে গিয়েছি। মিথ্যা কথাবার্তা বলেছে, সয়ে গিয়েছি।

তো, এর পর দেশের বাইরে আসলাম, ইংরেজিতে কমিউনিকেট করার ঝামেলা নিয়ে কথা তো আগেই বলেছি। আমি যেখানে আমার ইংরেজি এক্সেন্ট নিয়েই ইন্সিকিউরিটিতে আছি, এখন প্রফেশনাল কনফ্লিক্ট হলে কি করবো? আমি যে কথা বাংলাতেই আদৌ বলতে জানি না, সেটা ইংরেজিতে কি বলবো?

আমি শুরু করি একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করে - কেইস স্টাডি হিসেবে। বুঝতে সুবিধা হবে তাতে।

আমি মাস্টার্স করতে যাই টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপ নিয়ে, ফুল ফান্ডিং ছিলো এই জবের উপরে ভিত্তি করে। এবং, যাওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই পড়ানো শুরু করতে হয়। কোনো ট্রেইনিং দেয়নি ওরা, যেটা আমেরিকাতে দেয়। যিনি আমার

সুপারভাইজার ছিলেন, উনি নিজেই মাত্র ঢুকেছেন শিক্ষক হিসেবে। ঠিকঠাক কিছুই বলতেন না। আর, সাথে কো-টিএ যে মেয়েটি ছিলো, ও অনেক সিনিয়র পিএইচডি স্টুডেন্ট ছিলো। তো, এরমধ্যে যেটা হোলো আমার প্রথম প্রফেশনাল ভুল - আমাকে যে যে ক্লাস নিতে বলা হোলো, আমি তাতেই "অসুবিধা নাই" বললাম। অন্যরা নিজেদের মত করে সুবিধা অনুযায়ী ক্লাস নিলো। যা যা বাকি আছে, সেগুলো আমি নিলাম।

আমার টিএশিপ এর ক্লাস টাইম আমার নিজের ক্লাস থেকে ১০ মিনিট পরে ছিল, এবং এই দুই ক্লাসরুমের অনেক দূরত্ব ছিলো। সেই প্রফেসরও প্রতিদিন ৪/৫ মিনিট বেশি পড়াতেন। এর পর ৭/৮ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব ছিল। তো, আমি প্রথমদিন অনেক দৌড়ে আমার টিএ ক্লাসে গেলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে। এরপর আমার যিনি সুপারভাইজার ছিলো, তার অফিসে গিয়ে বললাম সমস্যা হচ্ছে। মুখে বলেছি, ইমেইল করিনি - এটা দ্বিতীয় ভুল। মুখে বলার কোনো প্রমাণ থাকে না, আমি জানতাম না।

এরপর উনি যেহেতু কিছুতেই কিছু করতেন না, এখানেও কিছু করেননি। এরপর কিছু ছাত্র নালিশ করে, আমাকে ডেকে পাঠায় এডমিন থেকে। তখন তিন সপ্তাহ হয়েছে আমি গিয়েছি, প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি এই তলবে। আমি দেরির নালিশ শুনেই আমার সুপারভাইজারের দিকে তাকালাম, উনিও রুমে ছিলেন। চুপ করে বসে উনি আমার দোষ দিয়ে গেলেন। আমি গুছিয়ে বলবো, সেই সাহসও আমার ছিলো না।

খুবই অপমানজনক ঘটনা। অনেক খারাপ লেগেছ। আমি কি করেছি এরপর?

কিছুই না।

জীবনযাপনের অভ্যাসে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট না থাকার কারণেই এশিয়ান মেয়েদের পশ্চিমা একাডেমিয়ায় দাম আছে। আমরা হ্যাঁ বলতে থাকি, এতে অনেকের কাজে সুবিধা হয়। প্রায় নয়াদুনিয়ায় স্লেইভের মত।

আমার কিন্তু অধিকার ছিলো জানানোর যে এখানে অন্যায় হচ্ছে। আমি প্রথমেই মুখে না বলে ইমেইল করলেও আমার প্রমাণ থাকতো। এরপরেও প্রথম সেমিস্টারে আমার কো-টিএ আরো অনেক কিছুই করেছে - পুরো গ্রেডিং আমার উপর দিয়ে ভ্যাকেশনে গিয়েছে যেটা কন্ট্র্যাক্ট অনুযায়ী অন্যায়। আমি কিছু বলিনি, কি বলবো বুঝিনি।

একাডেমিয়ায় গত দশ বছরে আস্তে আস্তে যে একটা ব্যাপার ভালো করে বুঝেছি যে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট না জানলে প্রফেশনালি টিকে থাকা যাবে না। বার্গেইনিং করতে জানতে হয়। ধরুন, এত সাধারণ জায়গাতেই আমি কিছু বলতে না পারলে পরে গবেষণা পেপারে কোঅথরশিপ নিয়ে কিভাবে আলোচনা করবো সিনিয়রদের সাথে? কিভাবে নিজের রিসার্চ প্রোফাইল দাঁড় করাবো যদি এই বার্গেইন করতে না পারি? এই ধাপগুলো শেখা জীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমার মতে, প্রফেশনাল জীবনে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের প্রথম ধাপটা হচ্ছে এইগুলো পারসোনালি নেওয়া যাবে না। কিছু মানুষ তাদের নিজের লিমিটেশনের জন্য অন্যদের ব্লেইম করে। আমার টিচিং সুপারভাইজার যে ওইদিন চুপ থেকে একটা মিথ্যা বললেন, সেটা আমি পারসোনালি নিয়েছিলাম। কিন্তু আজকে এসে বুঝি, ও নিজেই নতুন প্রফেসর। নিজেকে বাঁচাতে কাজটা করেছে। সবাই নিজেকে বাঁচাতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। আমি নিজেকে কতটা বাঁচাতে

পারছি, এটা হচ্ছে প্রশ্ন। বাঙ্গালি "ভদ্র" মেয়েদের তো এই প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় দাম নেই। আমার মা আমাকে যে "ভদ্রতা" শিখিয়েছেন, সেটা দিয়ে দুনিয়াতে টিকে থাকা যাবে না।

ডকুমেন্ট রাখাটাও শিখেছি এর মধ্যে। প্রোএক্টিভ হওয়া শিখেছি - যা লাগবে, দ্রুত জানানো। এডমিনের দায়িত্ব এইসব সমাধান করা - আমার দায়িত্ব পড়ানো এবং গবেষণা করা। আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ইমেইল লেখা শেখা। এফেক্টিভলি ইমেইল লিখতে জানতে হয়, শিখতে হয়। যেটা আসলে এখন নিজে শিক্ষকতায় এসে দেখেছি যে আমাদের ছাত্রদের একেবারে ক্লাসে বসিয়ে শেখানো হয়। চিন্তা করুন, আমেরিকান ছাত্রদেরই বারবার ক্লাস করিয়ে প্রফেশনালিজম শেখানো হয়। যেখানে দেশে তো আমরা প্রফেশনাল কিছুই শিখে বের হইনি ঢাবি থেকে। আমাদের শিক্ষকদেরই প্রফেশনালিজম নেই, ছাত্রদের কি শেখাবেন! এই নিয়ে এখানে কথা বলতেও চাই না; বরং কি করে প্রফেশনালি কনফ্লিক্ট ম্যানেজ শেখা যায়, তাই নিয়ে কথা বলি।

সামনে কথা হলেও সব আলোচনা সবসময় ইমেইলে রাখা দরকার, ডিটেইলস। যাতে কোনো ঝামেলা হলে একটা রেফারেন্স থাকে। কাউকে একটু মাইক্রো ম্যানেজার, বর্ডারলাইন টক্সিক মনে হলে তো অবশ্যই। প্রতি মিটিং এর লগ থাকবে যাতে কেউ পরে ব্লেইম করতে না পারে। আমি ব্লেইম নেওয়ার জন্য ঘাড় পেতে দাঁড়িয়ে থাকলে, মানুষ ব্যবহার করবেই। থিসিস সুপারভাইজার এর প্রতি পারসোনাল এক্সপেকটেশন কমানোও দরকার। আমাদের দেশের হিসেবে গবেষণায় যিনি সুপারভাইজার হন, তাঁকে তো "গুরু" মানি আমরা। নর্থ আমেরিকায় এরা জাস্ট কলিগ - সিনিয়র, কিন্তু কলিগ। তাঁর ভুল হতে পারে, তাঁর অনেক কাজও আছে, পরিবার আছে, বাচ্চাকাচ্চা আছে। সেই সব হিসেবে আমার গুরুত্ব কম অনেক - এটা বোঝাটাও দরকারি। আমাকে কেন এটা বললো, ওই মিটিং কেন ক্যান্সেল করলো, আমার লেখা কেন খারাপ বললো - ইত্যাদি কথার আসলে তেমন লাভ নেই। পিএইচডি সুপারভাইজার এর সাথে সম্পর্কটা প্রফেশনালি হ্যান্ডেল করা শেখা খুব দরকারি। যা বলছে সেটা সময় দিয়ে বলছে, অনেক সময় ক্রিটিসাইজ নিতেও শিখতে হয়। আবেগ দিয়ে তো গবেষণা হয় না। কেউ কিছুতেই খারাপ বলতে পারবে না, এই বদ্ধ ধারণা থেকেও বের হয়ে আসতে শিখতে হয়।

নিজের প্রায়োরিটি বুঝতে পারাটা আরেকটা ব্যাপার। কার কথা পারসোনালি নেবেন, কারটা নেবেন না? কাকে ইগ্নোর করে যাবেন? যেমন প্রিন্সটন ক্যাম্পাসে আমি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম কয়েকটা বেয়াদবের সাথে - কিন্তু ঐসব কনফ্লিক্ট একেবারেই রিএক্ট করিনি। কারণ, এদের কাউকে আমার লং-টার্মে লাগবে না। না লাগলে, পারসোনালি নেওয়ার মানে নেই কোনো। সময় নষ্ট করাটাই অনুচিত। আর একটা ঝামেলা আছে আমাদের সাউথ এশিয়ান মেয়েদের - অল্পতেই সব পারসোনাল ইনফরমেশন শেয়ার করা। সবাইকে সব বলাটা দরকার না। আপনি বারবার ন্যাগিং, ভেন্টিং এর মত নালিশ করলে, কাজের কথা না বললে - মানুষ আসলে রেস্পেক্ট করে না। কারণ, তাদের সময়ের দাম আছে। আমরা বাড়িতে, সিনেমায় দেখে বড় হয়েছি নারীদের এইসব ন্যাগিং, কিন্তু এখানে এসে আমি এতদিনে বুঝতে পারি যে এগুলো কোনো সমস্যার সমাধান না। নিজের এবং অন্যের সময় নষ্ট করা ছাড়া ন্যাগিং এর কোনো ভূমিকা নেই। রিজিলিয়েন্ট হতে শেখাটা বরং বেশি উপকারি।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এর মূল কথা এগুলোই বুঝে আত্মস্থ করা। হ্যাঁ, বাংলাদেশের নারী হিসেবে ন্যাগিং ছাড়া আর কিছুতে "মার্কেট" পাওয়া কঠিন। আমি লেখক হিসেবেও ব্যাপারটা দেখেছি। মানুষ আমার শিক্ষা,অর্থনীতি এসব নিয়ে লেখা পড়ে না। নারীদের কাছে থেকে পলিসি নিয়ে কথা নারীপুরুষ কেউই এক্সপেক্ট করে না বাংলাদেশে। কিন্তু বৈশ্বিক বিচারে দাঁড়াতে হলে এটা বুঝতে হবে। সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে কোপিং মেকানিজম পাল্টাতে হবে।

নর্থ আমেরিকান কালচারে সরাসরি কথা বলার একটা মূল্য আছে। আমাদের কালচারে কিছুটা ঘুরিয়েপেচিয়ে যেমন বলা হয়, তেমন না। আমাদের মধ্যে সরাসরি "না" বলার প্রবণতা নেই। এটাকেও কিছুটা পালটাতে শিখেছি আমি। যেটা করতে পারবো না বা করতে চাইছি না, সরাসরি না বলাই সবদিক থেকে ভালো। যে "না" বলতে পারে, সবকিছুতে "ইয়েস বস" করে না - তার জন্য সবারই আলাদা সম্মান আছে। আবার, এই কারণে, এখন দেশে বন্ধু-আত্মীয়দের সাথে সমস্যা হয়। সেটা নিয়ে অন্য কোনোদিন কথা বলবো!

আমি এগুলো এখনো শিখছি। পড়াশোনার চেষ্টা করি, এখনো অনেক সময় আমার ভেতরের "বাঙ্গালি ভালো মেয়ে" বের হয়ে আসতে চায়। তারপর আবার পস্তাই। তবে এটুকু বুঝেছি, যে কনফ্লিক্ট ঠিকঠাক ম্যানেজ করতে জানে, আজকের কোলাবরেটিভ একাডেমিয়ার যুগে সে অনেক দূর যাবে। এগুলো না বুঝতে পারলে ভালো রিসার্চ কোলাবরেটর পাওয়া যাবে না - আর না গেলে একাডেমিয়ায় টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব।

পর্ব ৫ : প্রোডাক্টিভিটি, টাইম ম্যানেজমেন্ট ("সময় গেলে সাধন হবে না")

কাজপাগল বলে বদনাম তো বাঙ্গালি জাতির জীবনেও ছিলো না। আমরা তো একটু ঢিলা জাতি। রাস্তায় হঠাত কারো সাথে দেখা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আধা ঘন্টা আড্ডা দেই। কোথাও যাওয়ার কথা ছিলো সেটা মাথায় থাকে না। আবার যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে আধা ঘন্টা পরে বেশ কনফিডেন্সের সাথে যাই। মানে সামাজিকভাবেই আমরা সবাই একটু লেথার্জিক। নিজের এবং অন্যের কারো সময়ের প্রতিই আমাদের তেমন মমতা নেই। বাংলাদেশে যারা বড় "স্কলার" বলে পরিচিত, তাদেরও অনেকেই বেশিটা সময় কাটান আড্ডা দিয়ে।

টাইম ম্যানেজমেন্ট এর বিভিন্ন স্পেকট্রামের মধ্যে আমাদের একেবারেই উল্টোদিকে হচ্ছে আমেরিকা। ভালোমন্দ কিন্তু বিচার করতে বসছি না। আমার কাছে বাঙ্গালি সময়জ্ঞান এবং আমেরিকান সময়জ্ঞান দুটোই এক্সট্রিম মনে হয়। কিন্তু আমি মনে করি এই বিদেশে এসে একাডেমিয়ায় দাঁড়াতে হলে প্রথমেই যে কয়টা জিনিস শিখতে হয়েছে আমাকে, তার একটা হচ্ছে - প্রোডাক্টিভিটি। আমি আমার জানাবোঝাই কিছুটা আলোচনা করতে চাই।

প্রথমে কয়েকটা ব্যাপার মাথায় রাখা ভালো। বাংলাদেশে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা "কনজিউমার" ধরণের। অন্য কেউ কিছু করে গিয়েছে, আমরা ভালোভাবে রেপ্লিকেট করি। আমাদের কালে তো কে কয়টা ধুতুরা ফুল খেয়েছে, তাও মুখস্থ করে যেতাম বাংলা পরীক্ষায়। আবার, আমেরিকায় একেবারে প্রথম থেকেই শিক্ষাব্যবস্থায় "প্রোডিউসার" ঘরানা ঢোকানো। অর্থ নিজে বের করতে হবে আইডিয়া, তাতে ভুল থাকলেও পরোয়া নেই। আপনি দেখবেন এখানে ছোটকালে বানান ভুল করছে, সেটা নিয়েও মাতামাতি করে না। আপনি যখন পড়াশোনায় "কনজিউমার" এর ভূমিকায় আছেন, আপনার প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে আসলে তেমন চিন্তার দরকার নেই। কিন্তু যখন প্রোডিউসার হচ্ছেন, তখন কতটা সময় ব্যয় করে কি উৎপাদন করছেন, এই ব্যাপারটা বোঝা দরকার। আর একাডেমিয়ায় যেহেতু এক পর্যায়ে গিয়ে আপনি কেবলই প্রোডিউসার, তাই প্রোডাক্টিভিটি যত আগে থেকেই বুঝবেন, ততই ভালো।

বাংলাদেশে "খাটতে পারে" এর চেয়ে বেশি প্রচলিত "মাথা ভালো"। এর আবার একটা জেন্ডার ভার্সনও আছে। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন মানুষ কিভাবে ছেলেমেয়েদের রেজাল্ট বর্ণনা দেয়। ছেলেটা ভালো করেনি কারণ ও "একটু দুষ্ট" তো। ছেলেটা ভালো করেছে কারণ ও "ব্রিলিয়ান্ট"। মেয়েটা ভালো করেছে কারণ ওর "অনেক মুখস্থবিদ্যা"। মেয়েটা খারাপ করেছে কারণ ও "বলদ"। বাংলাদেশে স্বাভাবিক সিস্টেমে আমি যতদিন স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, প্রোডাক্টিভিটি বলতে ধারনা ছিলো না।

প্রোডাক্টিভিটি শব্দটা শুনেছি এই দেশে এসে। সেটাতে যাওয়ার আগে বলি আমি স্বীকার করে নেই যে আমি প্রচলিত ভাষায় "আঁতেল" ছিলাম। মানুষ টিটকারি দিয়ে যেটা বলে আরকি! আমার পড়াশোনার অভ্যাস ছিলো। সিস্টেমেটিক

প্রোডাক্টিভিটি না বুঝলেও পড়াশোনাটা একটা অভ্যাসেরও ব্যাপার। সেই অভ্যাসটা আমার বা আমাদের অনেকের ছিলো কারণ আমরা প্রচণ্ড কম্পিটিটিভ পরিবেশে বড় হয়েছি। কিন্তু এই অভ্যাস থাকা সাহায্য করলেও এটা সিস্টেমেটিক না। আমার ছাত্ররা যেভাবে পরীক্ষা নিয়ে প্রায় কোনো আতংকেই থাকে না, সেটা আমি অনেক চেষ্টা করেও আনতে পারিনি। তবে, দুই এক পরীক্ষায় ধাক্কা খেয়ে একটা ব্যাপার প্রথমেই ঠিক করে ফেলেছিলাম যে এই দেশে সারারাত জেগে পড়া যাবে না। সারারাত জেগে পড়ে পরের দিন পরীক্ষা দিতে গেলে এত ইন্টিউটিভ প্রশ্নে কিছুই লেখা যায় না। এই পরীক্ষা/ডেডলাইন সংক্রান্ত আতংক কাটাতে টাইম ম্যানেজমেন্ট, একাডেমিক প্রোডাক্টিভিটি বোঝা দরকার।

আমার মতে প্রথম স্টেপ হচ্ছে লং টার্ম গোল সেটিং। মানে, এই যে আপনি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন? এক বছর পর কি করবেন? পাঁচ বছর পর কি করবেন? এই ধরণের গোল সেটিং (goal setting) যতই সাবজেক্টিভ হোক এবং যতই "ধরা" খাওয়ার চান্স থাকুক না কেন, আপনার মধ্যে ফোকাস আনাবে। কোনদিকে যাচ্ছেন, এটা মাথায় রাখা প্রচণ্ড দরকার। প্রয়োজনে লিখে রাখুন। আমি কাগজে লিখে দেওয়ালেও টাঙ্গিয়ে রেখেছিলাম। চোখের সামনে থাকার জন্য যা দরকার, সব করুন। যাতে মাথায় কেউ একজন নিজে থেকেই ফোকাস থেকে সরলে চড় মারে। আপনি প্রথমদিকে এলোমেলো গোল সেটিং করলেও দেখবেন একটা সময়ের পর নিজেই নিজের ক্ষমতা এবং এম্বিশান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। গোল এডজাস্ট করাটাও গোল সেটিং এর অংশ।

লং-টার্ম গোল মাথায় রাখলে এরপর এই সেমিস্টারে কি করবেন, এই বছরে কি করবেন - এই গোলগুলো ঠিক করে রাখতে হবে। একাডেমিয়ায় মূলত সবাই সেমিস্টার ধরে ব্লক করে। তো, ধরুন, একটা বড় পৃষ্ঠা নিয়ে চার কলামে ভাগ করলেন। একেক কলাম একেক মাস। চার কলামে এক সেমিস্টার। এতে পুরো সেমিস্টারের প্ল্যান আপনার চোখে থাকবে। বড় প্ল্যানগুলো এখানে লিখে রাখলে ভালো। যেমন, আমার আজকের বাস্তবতায় বড় ডেডলাইন হয় জার্নালে পেপার সাবমিশন, কনফারেন্স, এনুয়াল রিভিউ পেপার ইত্যাদি। এগুলোর ডেডলাইন এমন একটা জায়গায় তুলে রাখা ভালো যাতে ভিজুয়ালাইজ করা যায়।

এরপর প্রতি মাসের চার সপ্তাহে আগেই ব্লক করে বাদ দিয়ে রাখুন যে সময়গুলো অন্য কাজে ব্যস্ত। যেমন, আমার ক্ষেত্রে যে সময় আমাকে পড়াতে হয় বা পড়ানোর প্রিপারেশন নিতে হয়, ওটা নিতেই হবে - সেমিস্টারের প্রথম থেকেই জানি। দৈনন্দিন কাজ, ফ্যামিলি টাইম সব এভাবে আলাদা করা যায়। সব ব্লক বাদ দিলে যে সময়টা থাকবে, সেটা আপনার পড়াশোনার সময়। গ্র্যাজুয়েট স্কুলের ক্ষেত্রে আইডিয়ালি এই কাজের সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি পিএইচডি থিসিস লেখার সময় এটা সপ্তাহে প্রায় ৭০/৮০ ঘন্টা হয়েই যাবে। প্রোডাক্টিভিটি মানে হচ্ছে এই সময়টা ব্যয় করে আপনি কি করছেন, কতটা লিখছেন, কতটা ভালো লিখতে পারছেন - এটাই বুঝতে পারা। প্রথমে কিছুই হবে না, আতংকের জোরে আপনি নিজের পেপার না লিখে অন্যের পেপার পড়তেই থাকবেন - এটাও প্রসেসের অংশ। ইংরেজি দেশে এসে ইংরেজিতে কথা বলে এখন গোটা পেপার ইংরেজিতে লিখতে হবে - সহজ কথা তো না। কিন্তু শেষ ঐটাই - একমাত্র লেখাটারই মূল্য আছে গ্র্যাজুয়েট স্কুলে এবং একাডেমিয়ায়।

এরপর আমার মত কোয়ান্টেটিভ সাবজেক্টের ক্ষেত্রে একটা বড় কাজ হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট শেখা। রিপ্রোডিসিউবল কাজ কিভাবে করবেন, সেটা শেখা। গ্র্যাজুয়েট স্কুলে বক্স বা ড্রপবক্স একাউন্ট ফ্রি দিতে পারে - এমন কিছু ব্যবস্থা করে নিতে হবে। আপনার সাবজেক্ট বিশেষে ভালো করে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ধাপগুলো বোঝা দরকার হবে যাতে সময় নষ্ট না হয়। যতটা পারা যায়, সব রিপ্রোডিউসিভল রাখতে হবে। রাইটিং গ্রুপ তৈরি করতে পারেন বন্ধুদের সাথে। আরেকটা ব্যাপার আমার মধ্যে আগে ছিলো না, ইদানীং চেষ্টা করি মেনে চলার। কাজ শেষ করার সময় স্পেসিফিক থাকতে হবে। সন্ধ্যা ছয়টা হোক, সাতটা হোক - যাই হোক, এটা থামাতে হবে। কাজ সারারাত ধরে করবো ভাবলে কাজের জন্য আলস্য বাড়ে।

শরীরের নাম মহাশয় - যা সওয়ায় তাই সয়। কিন্তু প্রোডাক্টিভিটির জন্য "তেল" প্রয়োজন। খাবার আপনার সেই ফুয়েল। গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সময়টাতে আমি বিশাল ফলোয়ার ছিলাম মিল প্রিপের (meal prep)। অর্থ, একদিন রান্না করে বাটিতে করে তিন দিনের খাবার রেখে দেওয়া। নিয়মিত গ্রোসারিতে যাওয়া, সহজে রান্নার কিছু রেসিপি রাখা - এগুলো অনেক কাজে দেয়।

এর বাইরে যা আছে, আসলে পুরোটাই কাওস (chaos)। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় এবং ভালো সিদ্ধান্ত ছিলো যে আমি ২০১১ - ২০১৯ গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সময় ফেসবুক ব্যবহারই করিনি। এত চেঁচামেচির মধ্যে ফোকাসড রিসার্চ আমাকে দিয়ে হোতো না। মানুষ বিরক্ত করার চেষ্টা করবেই। হাবিজাবি বলবে, টিটকারি দিবে। কেউ কেউ না বুঝে করবে - অনেকে আপনার সময় নষ্ট করার জন্যই করবে। কিন্তু আপনার লক্ষ্য বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনার। একাডেমিয়া প্রচণ্ড লং-রেসের গেইম।

পেশেন্স (patience), প্রোডাক্টিভিটি এগুলো রক্তের ব্যাপার না - অভ্যাসের ব্যাপার। কাল নিউপোর্টের (Cal Newport) বই এবং ভিডিও রেফারেন্স দিয়ে রাখলাম - একাডেমিয়ার লোকজনের খুব প্রিয়। সবাইই ফলো করেন।

[(1232) Cal Newport - YouTube]

<u>পর্ব ৬ঃ Career Advancement and Planning ("কোন বা পথে নিতাইগঞ্জ যাই!")</u>

ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা বাদ দিলে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা ব্যাপারটার মূল্যই তেমন থাকে না। পড়ার জন্য পড়া তো ঘরেই করা যায় - সার্টিফিকেটের জন্য গিয়েছিই যখন, সেটা কি কাজে লাগবে এটাও বোঝা দরকার। অথচ, বাঙ্গালি ঘরে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা জানে, তারা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। স্কুল না হোক, ইন্টারমিডিয়েট লেভেল থেকে প্রফেশনাল ক্যারিয়ার প্ল্যানিং প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই থাকা প্রয়োজন ছিলো। এককেটা বাচ্চার আগ্রহ বুঝে তাকে মেন্টরিং করার মত পরিবেশ আমাদের মত ঘনবসতি অঞ্চলে রাখাটা হয়তো সম্ভব না। সেটা নিয়ে আলোচনা অন্য কোথায় হবে। দেশে থাকতে আমার ক্যারিয়ার প্ল্যান অনার্সে মোটামুটি এটাই ছিলো যে আমি বাইরে ভালো কোথাও পড়তে যেতে চাই। পড়ে কি হবে, কে জানে! অত চিন্তার দরকার মনে করি নাই।

দেশের বাইরে পড়তে যাওয়ার আগেই কিছুটা ধারণা থাকলে আসলে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায়। মাস্টার্সে যাবেন না সরাসরি পিএইচডিতে? এমবিএ করবেন? সেলফ ফান্ডিং এ পড়বেন? কতটা পর্যন্ত সেলফ ফান্ডিং এ পড়লে রিটার্ন ভালো হবে বলে মনে করেন? কোন দেশে থাকতে চান লং টার্মে? বাংলাদেশে কি ফেরত যাবেন নাকি বাইরে থাকার চেষ্টা করবেন? এই অনেকগুলো প্রশ্ন নিজেই নিজেকে করা উচিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে। সব উত্তর আপনার জানা থাকবে না, কিন্তু এগুলো চিন্তা করতে সাহায্য করবে। আমি যেমন জানতাম আমেরিকায় ইকোনমিকসে মাস্টার্সে ফান্ডিং দেবে না, তাই কানাডায় এপ্লাই করেছি।

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যারিয়ার নিয়ে আমাদের ছাত্রজীবন পর্যন্ত অন্তত কোনো কথা হোতো না। শিক্ষকেরা বিসিএস পরীক্ষার্থীদের টিটকারি মারতেন - সবজায়গাতেই। কিন্তু গণহারে এত এত ছাত্র কই যাবে, সেটা নিয়ে গাইড করতেন না বা করার আইডিয়া তাদের ছিলো না। যে কয়জন ভাগ্যদোষে বা গুণে উপরের দিকে রেজাল্টে ছিলো, তাদের জন্য একটা নাম ছিলো "টিচার ফাইটার"। এর মানে হোলো যেহেতু অনার্স/মাস্টার্সের রেজাল্টের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষক নিয়োগ হবে, তাই এদের উপর সবার কড়া নজর থাকবে। এদের একটু কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকবে না। আমার নিজের আন্ডারগ্র্যাডের ছাত্র এখানে দেখি - ভালো রেজাল্ট করা ছাত্ররা একত্রে পড়াশোনা করে, সেখানে আমাদের এই "টিচার ফাইটার" পরিবেশের ফলে আমাদের দেশে ভালো ছাত্ররা অহিনকুল সম্পর্কে থাকে বেশিরভাগ সময়। রেজাল্ট ব্যাপারটাই যে একটা প্রাইভেট ইনফরমেশন, এই আইডিয়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলো না।

এত দমবন্ধ কম্পিটিশনের মধ্যেই একটা কথা উল্লেখ করি - আমি আমার চেনাজানায় ছেলে সহপাঠীদের মধ্যে ক্যারিয়ার নিয়ে তবু কিছু চিন্তা দেখেছি। একত্রে প্রিপারেশন নিতেও দেখেছি - জিআরই বা বিসিএস এর জন্য। আলোচনা আসতো কিছু আশেপাশে। অন্যদিকে, আমি বাংলাদেশে স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের আড্ডার বিষয়ে ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা দেখিইনি। এই চিন্তাটা ভীষণভাবে প্রয়োজন। মেয়েরা "ভালো রেজাল্ট" করাটাকেই জীবনের মূলমন্ত্র বানিয়ে বসে ছিলো বা এখনো আছে, কিন্তু "ভালো রেজাল্ট" জীবনে একটা পছন্দমত ক্যারিয়ার তৈরির খুব ছোটো একটা অংশ। তেমন বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ না। "ভালো রেজাল্ট" করে কি কাজে লাগাবো, সেটাই বড় কথা, আলোচনার কথা হওয়া উচিত ছিলো।

ক্যারিয়ারের অপশন নিয়ে চিন্তা করতে আমাকে বেশি বেগ পেতে হয় নি দেশের বাইরে গিয়ে। কারণটা হচ্ছে আমি মিলে গিয়েছিলাম খুব পরিশ্রমী একটা গ্রুপের সাথে। তো, এই মাস্টার্সের পর কোন কোন পথে যাওয়া যাবে, কি কি করা যাবে - তাই নিয়েই ওরা আলোচনা করতো দিনরাত। চাইনিজ তো আবার অনেক বড় গ্রুপ, সবখানে নেটওয়ার্ক। এর একটা এফেক্ট আমিও পাই - শুনে শুনে শিখতাম। একেক দেশের একাডেমিক পরিবেশ একেক ধরণের। প্রশ্নটা ভালোমন্দের না, প্রশ্নটা আপনি কি করতে চান তার। আমি কানাডায় মাস্টার্স শেষে পিএইচডি আমেরিকায় করতে চেয়েছিলাম মূলত কারণ কানাডার একাডেমিক জব মার্কেটের অবস্থা ভালো না ইকনমিক্সে। সেটাও আমরা ওই অবস্থাতেই অংক কষে বের করি। সিনিয়র নামকরা পিএইচডি স্টুডেন্টরা কানাডার ভেতর একাডেমিক জব পেতে অনেক ভুগছিলো। অনেকেই ব্যাংক অফ কানাডাতে জব নিয়ে যাচ্ছিলো, কেউ কেউ

আমেরিকাতে চলে আসছিলো জব নিয়ে। কানাডা ছোটো হওয়ায় অনেকক্ষেত্রেই বেশি অপশন নেই একাডেমিয়ায়। কানাডায় থাকলে সুবিধা হত আমার ভিসার ক্ষেত্রে, এটা ঠিক। আমার মাস্টার্স এডভাইজার ভিসার কথাটা তুলেওছিলেন। সামনের অপশনগুলো ভালোভাবে না বুঝলে আগানো সম্ভব না। এবং, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটাই আমরা অনেকেই চিন্তা করে না। একটু ঢিলেঢালা সমাজ হওয়ার কারণে প্ল্যানিং ছাড়াই আমাদের অনেকদিন চলে যায়।

কোন কোন ক্যারিয়ার অপশন থাকে? আমি ইকনমিক্স নিয়েই বলি - নিজের স্পেশালাইজেশন অনুযায়ী খোঁজ নিতে হবে। প্রথমত প্রশ্ন হচ্ছে আপনি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরতে চান নাকি বাইরে সেটলড করতে চান। দেশে যদি আসতে চান, শিক্ষকতার বাইরে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে ভালো জব আছে। বিসিএস যেহেতু বয়সের ব্যাপার আছে, আর বাংলাদেশে যেহেতু পলিসি পর্যায়ে বয়স্ক হলেও হায়ার করবে না, আপনার দেশে ফেরার ইচ্ছা থাকলে আগে চাকরি নিয়ে পড়তে আসাই ভালো হবে। তাতে ফিরে গিয়ে চাকরিতে জয়েন করতে পারবেন। সমস্যাটা হচ্ছে, এই চক্রে অনেকেই অনেক বেশি বয়সে পিএইচডি শুরু করেন। যে পরিমাণ চাপ নর্থ আমেরিকায় পিএইচডিতে থাকে, সেটা আমার মতে ২৫ বছর বয়সে সামাল দেওয়া সোজা। আবার, আশেপাশের সহপাঠীদের সাথে কানেকশন তৈরি করাও সোজা একই বয়সের হলে। সবদিক ভেবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ভালো।

দেশের বাইরে থাকতে চাইলে মাস্টার্স করে জব মার্কেটে যাবেন নাকি পিএইচডি করবেন - এটা বড় প্রশ্ন। একেবারেই মূলধারার একাডেমিক হওয়ার ইচ্ছা না থাকলে পিএইচডি করলে অপরচুনিটি কস্ট অনেক বেশি, তাই ভালো করে চিন্তা করে ঢোকাই উচিত। একাডেমিয়ায় থাকতে না চাইলে সার্টিফিকেটের জন্য পিএইচডি করার বাঙ্গালি তরিকা আমি একেবারেই সাপোর্ট করি না। মাস্টার্স করে প্রফেশনালি সেটল হওয়া যায়, ওই পাঁচটা বছর ক্যারিয়ারে অনেক উপরে ওঠা যায়। আমার বন্ধুরা আছে অনেকেই আমার সাথে মাস্টার্স করে এতদিন বিভিন্ন জায়গায় ভালো পজিশনে আছে - পলিসি জব, ব্যাংক - কমার্শিয়াল অর্গানাইজেশনের জব এসবেই আছে। অনেকে মূলত ডাটা সায়েন্সের পলিসি দিকটাতে গেছে। এটাও একটা চিন্তার বিষয় - স্কিল ডেভেলপ করতে হবে যেই দিকে যেতে চান, সেটা বুঝে। স্কিল ডেভেলপ নিয়ে, প্রোগ্রামিং ভীতি নিয়ে অন্য আরেক পর্বে কথা বলবো।

একাডেমিক জবের আগ্রহ থাকলে অনেককিছু ভেবে - সব রাস্তা দেখে - কাঠখড় পুড়িয়েই পিএইচডিতে ঢোকা উচিত। আজকের প্রতিযোগিতার যুগে কোন ইন্সটিটিউশন থেকে পিএইচডি করেছেন, কার সাথে করেছেন, কয়টা পাবলিকেশন, কয়টা গ্র্যান্ট- ইত্যাদি সব চাহিদা কেবল বাড়ছেই। এগুলো নিয়ে কিছু পড়াশোনা ছাড়া, ভালো মেন্টরিং ছাড়া পিএইচডিতে ঢুকলে ফ্রাস্টেশন বাড়বে। পিএইচডি তো অনেকগুলো বছরের ব্যাপার, অনেক প্রেশারের ব্যাপার, অনেক লোনলি একটা জার্নিও - বিশেষত আমরা যারা ল্যাব বেইজড কাজ করি না, তাদের জন্য। আমার সাথে কোনটা মানাবে, সেটা নিজেই ভালো জানে মানুষ। আমি অনেককে দেখি ভিসার জন্য পিএইচডি করতে, আমার কাছে এই আইডিয়াটা বেশ কিছুটা ঝামেলার মনে হয়। পাঁচ/ছয় বছরের রিসার্চ কমিটমেন্ট না থাকলে পিএইচডি ডিপ্রেশন জন্ম দিতে পারে। আমেরিকান রিসার্চ ইকোসিস্টেমে ফান্ডিং আছে কারণ ওদের এসিস্ট্যান্ট লাগে, কিন্তু তার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে পিএইচডি করাটা তেমন ভালো সিদ্ধান্ত অনেকের জন্য না। এটা বুঝে, সব ইনফরমেশন আগেই মাথায় রেখে ঢুকলে চাপটা সামাল দেওয়া সোজা হয়।

একাডেমিক জব পেতে হলে ইদানিং পোস্টডকও লাগে অনেক ক্ষেত্রেই। অর্থ - একটা ফ্যাকাল্টি জব পেতে আট থেকে দশ বছরের কমিটমেন্ট থাকা লাগবে। কেবল জবটাতে ঢুকতেই এতগুলো বছর উদয়াস্ত কষ্ট করা লাগে। এই প্রশ্নগুলো তাই আগে থেকেই চিন্তা করা দরকার। কি চাই? কেন চাই? - এই দুটো আপনার ভ্যালু সিস্টেমের অংশ। এগুলো জানলে পরে প্রশ্ন আসে - কিভাবে চাই? সেটার জন্য প্ল্যানিং দরকার। লং-টার্ম গোল সেট করা নিয়ে আগেই কথা বলেছিলাম।

আমেরিকা-কানাডাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ডিপার্টমেন্টেই আলাদা ক্যারিয়ার অফিস থাকে, সেন্ট্রালও থাকে। আসার পর থেকেই এদের সাথে সংযোগ রেখে চলতে হবে। কিভাবে সিভি/রেজুমি বানাবেন - কোন জবে কি লাগবে, সেগুলো জেনে রাখা ভালো। ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করে দেয় অনেক ডিপার্টমেন্ট - সেই সুযোগ নেওয়া অবশ্যই উচিত হবে। এগুলো আসার পর প্রথম সেমিস্টারেই করা শুরু করতে হবে।

আর, আমার মত "যায় যদি যাক প্রাণ" ধরণের একাডেমিয়াতেই থাকতে হবে টাইপ ক্যারিয়ার প্ল্যানিং মাথায় ঢুকলে, প্রথম থেকে ডিপার্টমেন্টের রিসার্চ সেমিনারগুলোতে যাওয়া ভালো। আগ্রহ পাচ্ছেন কিনা, এই ধরণের কাজ কন্টিনিউ করবেন কিনা সারা জীবনের জন্য - প্রশ্নগুলো মাথায় আনা উচিত। রিসার্চ কেবল একটা ক্যারিয়ার না, এটা অনেকটাই লাইফস্টাইল। সেই লাইফস্টাইল আপনার সাথে যায় কিনা, এটা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে।

পর্ব 7: একাডেমিক ইকোসিস্টেম ("আট কুঠুরি নয় দরজা - কিংবা তারও বেশি")

নেপোটিজম বলে একটা শব্দ ইদানীং খুব জনপ্রিয় হয়েছে। বিশেষ করে বলিউডে কে কার বাড়ি থেকে এসে কখন কি সুবিধা পেলো। আপনার পরিবারের কেউ বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু/পার্টনার কেউ একাডেমিক পথ দিয়ে গেলে আপনার কাছে কিছু তথ্য বেশি থাকবে। আমার ছোটো বোন আমাকে দেখে জেনেছে কিভাবে আমেরিকায় আসে মানুষ, এই ইনফরমেশন আমার কাছে যেমন ছিলো না। কিভাবে চলতে হবে, বলতে হবে - এগুলোই ইনফরম্যাল রিলেশন থেকে শেখা যায়। এভাবেই তো আসলে দুনিয়া আগায়। এটা অন্যায় না - অন্যায় হলে তো ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের সবটাই অপরাধ। বংশের পর বংশ ধরে যারা তাঁতের কাজ শেখেন, সেটাও অপরাধ? নেপোটিজমের এই আলোচনায় মানুষ কখনো বলে না আমি ভালো স্কুলে পড়েছি কারণ আমার বাবামা ভালো চাকরি করতেন। রবীন্দ্রনাথকে কি লোকে নেপোকিড বলে?

এই প্রসঙ্গ কেন তুলছি? কারণ কিছু তথ্য যেটা আমি দিতে চাই বারবার লিখে এটা মূলত তাদের জন্যই যারা পরিবার থেকে বা অন্য সূত্রে সুবিধাটা পাননি। নেপোটিজম সাবস্টিটিউট করা যেতো মার্কেটে যদি অনেকে এমন কন্ট্রিবিউট করতেন, এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতেন। একাডেমিয়ার তো বেশিটাই "হিডেন কারিকুলাম"।

কথা বলতে চাচ্ছি ইকোসিস্টেম নিয়ে। প্রফেশনাল ইকোসিস্টেম। একেক প্রফেশনে একেক ধরণের হিডেন কারিকুলাম থাকে। একাডেমিয়ারও আছে। একাডেমিয়ায় প্রথম ধাপেই এত কাজ যে বড় পিকচার শেখার সময় কই, রিসোর্স কই? এই হিডেন কারিকুলামটা আমি ধরতে পেরেছিলাম সাইমন ফ্রেজারের পরিবেশের কারণেই। এটা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে আমার নিজের পিএইচডি ডিজাইন করতে। তাই হিডেন কারিকুলামটা নিয়েই কিছু আলোচনা করতে চাচ্ছি।

বাইরে পড়তে যাওয়ার স্টেপগুলো কি? জিআরই, টোফেল ইত্যাদি দিতে হবে, স্টেটমেন্ট লিখতে হবে - এপ্লাই করতে হবে। প্রায় বছরখানের ধাক্কা। এগুলো দেখিয়ে আমরা বাইরে ফান্ডিং পেলে খুশি হই। আমার মত পরিবার থেকে যারা আসা, ফান্ডিং ছাড়া তো কিছু সম্ভব নয়। এখন দেখি অনেকেই নিজের ফান্ডিং এ পড়তে আসছে, দেশে ইকনমিক পরিবর্তন আসছে সেটা বোঝা যায়। আমি আমার মত জায়গায় থেকে যারা এসেছে - যাদের ফুল ফান্ডিং দরকার ছিলো, তাদের জন্য বলছি। এই ফান্ডিং পেয়ে খুশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এটাও বোঝা দরকার, এর মানে কি?

আমি যা লিখছি এটা ইকনমিক্সের জন্য।

ইকনমিক্সে আমেরিকার অনেক স্কুলই কেবল টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপ (TAship) দিয়ে আনে পিএইচডি ছাত্র। এর মানে হচ্ছে - আন্ডারগ্র্যাডের ছাত্র বা মাস্টার্সের ছাত্র পড়াতে হবে। প্রথমে আন্ডারগ্র্যাডের ছাত্রই দেবে। পিএইচডি এরও দুইএকটি ক্লাসে সিনিয়র কোনো ছাত্রকে টিএ বানায়। কিন্তু মূলত আন্ডারগ্র্যাড পড়াতে হবে। ঝামেলাটা এখানে না, ঝামেলা হোলো - টিএশিপে পড়তে আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো এসাইনড এডভাইজার থাকে না। আসার পর কথা বলে এডভাইজার খুঁজে বের করতে হয় সেকেন্ড বা থার্ড ইয়ারে গিয়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এডভাইজার পাওয়াটা একটা কম্পিটিশনের মত। আরো অনেক ভালো, স্কিল্ড ছাত্র লাইনে এগিয়ে থাকে। তাদের ভেতর দাঁড়িয়ে এডভাইজারকে কনভিন্স করা সোজা কথা না। এডভাইজার তো সবচেয়ে স্কিল্ড ছাত্রই নিতে চাইবেন।

আর একটা পয়েন্ট আছে - টিএশিপে কাজ করার মানে আপনি সরাসরি কোনো রিসার্চ প্রজেক্টে জড়িতে না। জড়িত না থাকার ফলে একটা রিসার্চ কিভাবে আস্তে আস্তে দাঁড়ায়, সেটা আপনি অটোমেটিক্যালি জানছেন না। পেপার কিভাবে সাবমিট করে, সাবমিশনের পর কি হয় - এই তথ্যগুলো আগে থেকে জানা খুব দরকার।

অন্যটা হচ্ছে রিসার্চ এসিস্ট্যান্টশিপ (RAship)। আরএ শিপ নিয়ে আসা মানে একজন প্রফেসর তাঁর অনগোয়িং কোনো রিসার্চ প্রজেক্ট থেকে আপনাকে ফান্ডিং দেবেন। প্রথম দিকে মূলত আপনাকে তাঁর জন্য ডাটা এনালাইসিস করে দিতে হবে। ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যারা কাজ করে, তাদের মূলত ফিল্ড কাজে পাঠিয়ে দেয় বিভিন্ন দেশে। অনেকটা সময় ট্রাভেলিং এ যায় প্রজেক্টের কাজে। এই ট্রাভেলিং বেশিটাই এডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ, ইন্টেলেকচুয়াল কাজ আসলে তেমন না। যেমন, আমার এক বন্ধু ছয় মাস কেনিয়া ছিলো ৬০০ জন প্রেগন্যান্ট মহিলা বের করে কথা বলতে।

ক্যাম্পাসের বাইরে থাকাটা একটা বড় অসুবিধা ফিল্ড কাজে। আবার, সুবিধা হচ্ছে এই প্রজেক্ট থেকে বের হওয়া পেপারে আপনার নাম থাকবে।

কোনটায় কি সমস্যা? দুটোরই তো ভালোমন্দ দিক আছে। টিএশিপে রিসার্চের গাইড নিজে খুঁজে বের করতে হয়, কেউ বাধ্য না রাজি হতে। আরএশিপে "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" হয়ে যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। আপনার জীবন এই যে টাকা দিচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে এবং তার প্রজেক্ট ভালো লাগুক বা না লাগুক আপনাকে করতে হবে। যদি আপনি বাইরে গিয়ে আবিষ্কার করেন এই প্রজেক্টে আপনি কাজ করতে চান না, সেটা থেকে বের হওয়া বেশ কঠিন। সহজ হোতো যদি আপনার কাছে নিজেকে ফাইন্যান্স করার মত টাকা থাকে। একই ডিপার্টমেন্টে অন্য কোনো প্রফেসরের কাছে যাওয়া খুবই কঠিন। ইগোর লড়াই লেগে যায়, এত সামাল দেওয়ার চেয়ে অন্য জায়গায় আবার এপ্লাই করা ভালো।

একাডেমিয়ায় হায়ারার্কি আছে, একাডেমিক জব মার্কেটের নিজস্ব এলগরিদম আছে, অনেক আনসার্টেইনটি আছে। একেবারেই ধারনা না থাকলে পিএইচডিতে ঢুকলে অনেক ফ্রাস্টেশন আসতে পারে। কারণ, একাডেমিয়া আসলে মুভিতে দেখা দূর্গ টাইপ বাড়িতে ক্লাস হচ্ছে, প্রফেসর আলাভোলা, ম্যাথ করে যাচ্ছে জানালার কাঁচে, তারপর একদিন নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে - বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমন না।

ইউনিভার্সিটি একটা রেভেনিউ মেশিন। এই মেশিনে অংশ নিতে হলে, জব প্রোমোশন নিশ্চিত করতে প্রফেসরদের দরকার রিসার্চ পেপার যেটাকে দেখিয়ে তারা আরো ফান্ডিং আনতে পারবেন। এই প্রক্রিয়াতে পিএইচডি স্টুডেন্টরা একটা ইনপুট, এবং বলাই বাহুল্য - খুবই রিপ্লেসেবেল ইনপুট। স্কিল ডেভেলপ নিয়ে আমি কথা বলবো অন্য কোনো পর্বে।

সব আপনি জেনে নিতে আগে থেকেই পারবেন না যাওয়ার আগে। কিন্তু মাথায় রাখাটা দরকার - সিস্টেম কিভাবে চলে? আমি ডিপার্টমেন্টে অনেক সময় কাটাতাম - সেটা এই হিডেন কারিকুলাম বুঝতে সাহায্য করতো। সেমিনারে, ব্রাউন ব্যাগে নিয়মিত যাওয়াটাও সাহায্য করবে সিস্টেম বুঝতে। একাডেমিক এই তত্যগুলো মূলত অনেকটাই ইনফরম্যাল - শুনে শুনে, দেখে দেখে শিখতে হয়। রিসার্চের ইকোসিস্টেমের সাথে কর্পোরেট ইকোসিস্টেমের খুব বেশি তফাত নেই। দুটোই মূলত প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ। প্রশ্ন হচ্ছে - সেখানে আপনার ভূমিকা কি হবে।

আপনি কতটা তথ্য জেনে সিস্টেমে ঢুকছেন, যা জানেন না সেটা কতটা সামাল দিতে পারছেন।

পর্ব ৮ঃ স্কিল ডেভেলপ এবং রিসার্চ মার্কেটে ভ্যালু ("আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে "রিসার্চের" সমুদ্র সফেন")

বাংলাদেশের পড়াশোনার সিস্টেমে আমাদের সময় পর্যন্ত স্কিল ডেভেলপ বলতে কোনো কথা ছিলো না। সেটাকে পড়াশোনার মধ্যে নিয়ে আসা তো অনেক পরের কথা। ইদানীং কথা শুরু হয়েছে, তাতেও অভিভাবকেরা তেমন খুশি নন। আমাদের পড়াশোনা সিস্টেমের ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা আমার কাছে এখনো লাগে তা হোলো - এর কোনো লক্ষ্য ছিলো না। পড়াশোনাই করে সবাই গণহারে - বিশেষত মাস্টার্স সবাই করাটা তো প্রচণ্ড আর্থিকভাবেই ক্ষতি। এই এত সার্টিফিকেটের সাথে জব মার্কেটের সংযোগ খুব কম।

রিসার্চ ইকোসিস্টেম বোঝার পর পরের কথা নিশ্চয়ই আসা উচিত - তাহলে এই অবস্থাতে আমি রিসার্চ মার্কেটে আমার ভ্যালু কিভাবে বাড়াবো? সেই প্রশ্নে যাওয়ার আগে দেশের বাইরে আসার আগে আমার কম্পিউটার স্কিল নিয়ে কথা বলাটা দরকার। ঢাবিতে তো আমাদের অবশ্যই কোনো ডাটা এনালাইসিস, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখানো হোতো না। আমি রিসার্চ ইন্টার্নশিপের কারণে কিছু কাজ জানতাম - মূলত স্ট্যাটা ব্যবহার বেসিক কিছু জানা ছিলো। প্রোগ্রামিং শেখা দরকার, এটাই কখনো মাথায় আসে নাই।

এরপর মাস্টার্সে গিয়ে দেখি আশেপাশের মানুষ এক বা একাধিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানে। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইকনমিক্সে কি লাগতে পারে সেটাও আমি জানতাম না। অথচ ম্যাক্রোইকনমিক্সের একটা বড় অংশই এই ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা - এমনকি মাস্টার্সেও। হাই ফ্রিকোয়েন্সি ফাইন্যান্সের একটা ক্লাস নেওয়ায় সেটা কিছু বুঝলাম। R এর সাথে কিছু পরিচয় হোলো। আমার এন্টি-প্রোগ্রামিং মাথায় এগুলো প্রথমে বিভীষিকার মত লাগতো। আমি অন্যের কোড রেপ্লিকেট করতেও পারতাম না ঠিকঠাক। মোটামুটি কনফিডেন্ট ছিলাম এগুলো আমাকে দিয়ে কোনোদিন হবে না। না হলে টিকে থাকা যাবে না এটাও আশেপাশের পিএইচডি ডিসার্টেশন লিখছে এমন মানুষ দেখলেই বুঝতাম। সারাদিন ম্যাটলাবে মাথা গুঁজে বসে আছে! তো, বাইরে গেলে পর এই ধাক্কাটা খাওয়ার ভালো সম্ভাবনা আছে আমার মত অনেকের। দেশে অনেক কাজই কেবল "কথা" বলে, রচনা লিখে কাটিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু এখানে ম্যাথ, স্ট্যাট নলেজের পাশাপাশি বিগ ডাটা তখন পপুলার হয়ে উঠছে। এখন তো বিগ ডাটা বেসিক স্কিলে পরিণত হয়েছে।

এই প্রসেসটা বোঝা, ভয় না পেয়ে নিজেকে প্ল্যান করে তৈরি করা খুব দরকার। এগুলো কিন্তু সিনিয়র প্রফেসররা তেমন সাহায্য করতে পারবেন না, এর জন্য যেতে হবে নতুন জয়েন করা এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কিংবা সিনিয়র পিএইচডি স্টুডেন্টদের কাছে। ওদের থেকে বুঝতে হবে কোন কোন স্কিল ডেভেলপ করাটা দরকার। একটা ভালো উপায় হচ্ছে ঐ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হচ্ছে এমন ক্লাস করা। আমি R প্রোগ্রামিং নিজেই শিখেছিলাম মূলত পিএইচডিতে গিয়ে, GIS শিখতে হয়েছে রিসার্চ শুরু করার পর। আমি নিজে এখন এগুলো আরও ভালো করে শিখছি ক্লাসে পড়াতে গিয়ে। বলা যায়, পড়াতে গিয়ে সব ভেতরের ধাপ ভালো করে শিখছি যেগুলো আমার নিজের আন্ডারগ্র্যাডে শেখা হয়নি। ভয় পেয়ে সময় নষ্ট ছাড়া আর লাভ নেই। আর এগুলো অত কঠিনও কিছু না, আমাদের বাংলাদেশি মেয়েদের মাথায় ঢুকে আছে যা কিছু প্রোগ্রামিং, যা কিছু টেকনিক্যাল - সেগুলো আমরা পারি না।

শেখা শুরু করলে প্রথমে কিছু ইনিশিয়াল মেন্টাল রেজিস্টেন্স তৈরি হতে পারে। কিন্তু আজকের যুগে এত অনলাইন হেল্প যে নিজেই ধীরে ধীরে শেখা কঠিন হবে না। আসলে কিছুটা তো আন্ডারগ্র্যাডেও শিখে রাখলে পরে অনেক কাজে দেয়। অন্তত ভয়টা কমে।

প্রথম কথা, বুঝতে হবে কি কি স্কিল ডেভেলপ করতে হবে। ইকনমিক্সে এর মত অনেক সাবজেক্ট যেখানে সোল-অথরড (sole author) পেপার কমন, সেখানে কিন্তু অনেক জায়গাতেই কোনো সাহায্য ছাড়াই পিএইচডি করতে হয়। আমার সব কাজ আমার নিজেরই করা ছিলো, এডভাইজার ফিডব্যাক দিয়েছেন - কিন্তু ল্যাবে যেমন কোলাবরেশন থাকে, তেমন আমাদের থাকে না অনেক ক্ষেত্রেই।

তো, রিসার্চের ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হচ্ছে শেখা কিভাবে টপ জার্নালে পাবলিশ করার যোগ্য পেপার লেখা যায়। এর প্রথম ধাপ হচ্ছে ফিল্ড ক্লাস নেওয়া এবং নিজেই নিয়মিত টপ জার্নাল এর পেপার পড়া। পেপার পড়া নিজেই একটা স্কিল। আমি প্রথমে অনেকদিন পড়ে বুঝতে পারতাম না। কিন্তু লেগে থাকতে হবে। সেমিনারে যেতে হবে, যাতে ধীরে ধীরে সিস্টেম মাথায় আসে। একটা পেপার লেখার কত হাজার ধাপ - এটা ঐ কাজ শুরু না করে বোঝা যায় না। কত

কিছু শুরু করে ছয় মাস কাজ করে তারপর বুঝেছি যে এটা ফেইলড প্রজেক্ট। কিন্তু এই ফেল করাটাই রিসার্চের বড় অংশ। আমার পিএইচডি ডিজার্টেশনের ফার্স্ট চ্যাপ্টার লেখা শুরু করেছিলাম ২০১৫ তে, পাবলিশ হয়েছে ২০২০ এ। মাঝে ২ বছর এটা নিয়ে কিছুই করিনি, বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় প্রতিটা প্রজেক্ট মিনিমাম ৪ বছর কাজ করতে হয় সব মিলিয়ে ইকনমিক্সে। ম্যাক্সিমাম ৮/১০ আমি নিজেই দেখেছি। তো, একটা পেপার লেখার জন্য কি কি শিখতে হবে - সেটা বের করাও সোজা না অনেক জায়গাতেই। প্রথম দুইটা পয়েন্ট - টপ জার্নাল রেগুলার পড়া, ফিল্ড ক্লাসে পড়া। কনফারেন্সে যাওয়া একটা ভালো উপায় যদি ইনভেস্ট করার অবস্থা থাকে।

আমি আগেও বলেছি, শেষ পর্যন্ত একাডেমিয়াতে একমাত্র "রিসার্চ আর্টিকেল"ই কারেন্সি। এটা বিক্রি করেই যা হওয়ার হবে। একটা ভালো রিসার্চ আর্টিকেলের তো অনেক ধাপ - কিন্তু শুরু থেকেই বেসিকগুলো মাথায় রাখতে চাইলে এগুলো গুরুত্বপূর্ণঃ ভালো জার্নালে পাবলিশ হওয়া আর্টিকেল পড়ে অন্তত ৫০%+ বুঝতে হবে। এই স্পিড দিনে দিনে বাড়বে। কিন্তু লেগে থাকতে হবে। ওরা কিভাবে লিখছে, কেন লিখছে - এটা বুঝতে এই রিডিং সাহায্য করবে। ডাটা নিয়ে ভালো রিসার্চ থাকতে হবে - কিভাবে রিসার্চ প্রশ্নের সাথে ডাটা মেলাতে হয়, এটা নিজেই একটা স্কিল। ম্যাথ/স্ট্যাট লাগবে থিওরির যে কোনো কাজে। একটা বেসিক কনসেপচুয়াল মডেল ছাড়া অনেক রিসার্চ আইডিয়া পাবলিশ করা যায় না।

স্কিল ডেভেলপমেন্টের আরেকটা বড় অংশ হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। মানে, ধরুন, আপনি ৫ বছর ধরে কাজ করছেন - আপনার কাজ তো রিপ্রোডিউসিবল হতে হবে। একেক স্পেশালাইজেশনে একেকটা পপুলার রাস্তা আছে। আমি নিজে ড্রপবক্স ১ TB নিয়ে রেখেছি - সব কাজ সেখানেই করি যাতে কিছু না হারায়। কোড ডিপোজিটের জন্য ইদানীং জিটহ্যাব পপুলার। এগুলো কারো সাথে বসে শিখে নিতে হবে। লাইব্রেরিতেও সাধারণত অনেক ওয়ার্কশপ হয়, সেগুলো নিয়মত যাওয়া ভালো হবে।

রাইটিং নিয়ে তো আসলে আমাদের ঝামেলার শেষ নেই। গ্রামার এর ঝামেলা AI কিছুটা মেটাবে, আশা করি। কিন্তু স্টাইলটা নিজেই শিখতে হবে। এডিটর এর সাহায্য নেই আমি অনেকসময়, কিন্তু সেটা এক্সপেনসিভ। আমার ক্লাসমেট কারো কারো এডভাইজারই এডিটরের জন্য টাকা দিতেন - তেমন হলে তো ভালো। প্রেজেন্টেশন স্কিল আরেকটা শেখার

ব্যাপার। এগুলো সাবজেক্ট-বিশেষে ভিন্ন হয়, তবে কিছু বেসিক ভালো বই সাথে রাখলে ভালো।

তো, মোটামুটি - সিনিয়র কারো সাহায্য নিয়ে বসে কি কি লাগবে বুঝতে পারলে - ধীরে ধীরে এগুলো ডেভেলপ করতে হবে। ভয়জনিত প্রোক্রাস্টিনেশন আসলে কাজে আসে না। আমি যেমন এখন সামারে দুইটা ভিন্ন রাইটিং ক্লাবের সাথে আছি। আমরা একত্রে বসে লিখি। এইরকম গ্রুপ খুঁজে নিলে কিছুটা সুবিধা হতে পারে - একে অন্যকে একাউন্টেবল রাখতে।

পর্ব ৯ঃ রিসার্চে এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ ("No one said it would be easy, but.....")

রিসার্চ শুরু করে মাঝপথে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সত্য বলতে স্কিলসেট নিয়েই ভয়ে ছিলাম। গিয়েই দেখি এটা পারিনা ওটা পারিনা, ইংলিশটাই ঠিকমত পারিনা - বাকিরা সবাই "সব" পারে। কারো কারো পিএইচডি শুরুর আগেই টপ জার্নালে পেপার আছে। সহপাঠী কেউ কেউ এমনভাবে মেন্টরিং করছে যেটা অনেক প্রফেসর এর চেয়েও ভালো। আমার মোটামুটি কিছুই নেই - না স্কিল, না কনফিডেন্স, না নেটওয়ার্ক। এই ইন্সিকিউরিটি, ফ্রাস্টেশন, আতংক থেকে বের হওয়ার আগেই পিএইচডি'র অনেকগুলো বছর শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু এখন পেছনে ফিরে দেখলে বুঝি রিসার্চের বড় কথা কিন্তু ঠিক স্কিলসেট না, রিসার্চের মূল কথা vision। ইমাজিনেশন - পাওয়ার অফ মেইকিং কানেকশন অফ ডিফারেন্ট স্যোশাল কনসেপ্ট। একটা প্যাটার্ন বোঝার চোখ। সমাজে তো সবাই আছে, সবাই ওই প্যাটার্নটা দেখতে পায় না। পায় না বলেই সবাই রিসার্চার না। আর, প্যাটার্ন দেখতে না পেলে, নতুন অচেনা কিছুর পেছনে ছুটে বেড়ানোর তাগিদ না থাকলে স্কিলসেট দিয়ে কেবল রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট হওয়া যায়, রিসার্চার না। যে কথাটা আমি বারবার আমার ক্লাসেও বলি, বিশেষত ডাটা সায়েন্সের ক্লাসে - স্কিলসেট ওভারহাইপড একটা ব্যাপার - ভেতরের প্রশ্নটা বোঝা লং-টার্মে বেশি জরুরি। স্কিলসেট না থাকলে বানানো সম্ভব, ক্রিয়েটিভ মাইন্ডসেট - কিউরিয়াস মাইন্ডসেট আর একটা বয়সের পর বানানো যায় না।

আমার ধারণা এই জায়গাটাতেই আমাদের - সাউথ এশিয়ান নারী শিক্ষার্থীদের সচেতন থাকা খুব বেশি দরকার। আমাদের আপব্রিংগিং এর মধ্যে একটা "জ্বী হুজুর" ভাব আছে। আমরা "না" বলতে পারি না - কি চাই সেটাও ঠিকঠাক বুঝি না। এই সামাজিকতাবোধ থেকে বের হয়ে পিএইচডি এডভাইজার বা অন্য কেউ যদি রিসার্চ আইডিয়া পছন্দ না করে, তাহলে সোজা থাকা সম্ভব কি? অথবা, আদৌ নতুন প্রশ্ন নিয়ে আসা কতটা সম্ভব। অন্য কেউ যখন পছন্দ করছে না, তখন নিজের আইডিয়ার পাশে শক্ত হয়ে দাঁড় হওয়ার জোর কই পাওয়া যায়! আর, নিজের আইডিয়ার পাশে জোর করে অনেক বছর দাঁড়িয়ে না থাকলে "স্কলার" তো হওয়া যায় না! আইডিয়াই বা নতুন কই পাওয়া যায় যেখানে আমরা বছরের পর বছরের ধরাবাধা সিলেবাসে পড়েছি!

সেটাই বলছিলাম - কিউরিয়াস মাইন্ড এর জোর স্কিলসেটের চেয়ে বেশি। যদিও শর্ট টার্মে, ইমিডিয়েটলি স্কিলের ঘাটতিটাই চোখে বেশি পড়ে। লং-টার্মে রিসার্চের ক্ষেত্রে কাজ করে সেই একটা গাটস ফিলিং যে এই প্রশ্ন নিয়ে হাতালে একটা উত্তর পাওয়া যাবে। এতও তো সোজা না। বড় বড় নামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলা, আমার ইন্টিউশন বলে এই আইডিয়ার একটা পয়েন্ট আছে - এটা নিজের মধ্যে আনাই কঠিন। আমরা কিনা "গরীবের মধ্যেও গরীব - ছোটোলোকের মধ্যেও ছোটোলোক" ভাব নিয়ে দুনিয়াতে ঘুরি। আমি আন্ডারগ্যাড ছাত্রদের জন্য ইবুকটাও এই কারণেই লিখেছিলাম - বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় "ভালো ছাত্র"দের বিশ্ব একাডেমিয়ায় "ভালো" না করতে পারার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই রেপ্লিকেশন। ফটোগ্রাফিক মেমোরির কিছু বেনিফিট অবশ্যই আছে, কিন্তু "নতুন" প্রশ্ন নিয়ে আসতে পারার জন্য চাই "পড়াশোনা" - "দেখা ও শোনা"র ক্ষমতা, কানেক্ট করার ক্ষমতা। আউট অফ দ্য বক্স আসার লড়াইটা এত সোজা না।

রিসার্চ ইকোসিস্টেম নিয়ে আগের পর্বে কথা বলছিলাম। ইকোসিস্টেমটা বুঝে থাকলে এবার ভাবুন, কেন এই ইকনমিক্স বা স্যোশাল সায়েন্সের অন্য ফিল্ডে আপনাকে নিয়ে আসতে চাইতে পারে পাশ্চাত্য ইউনিভার্সিটি? আপনার ভ্যালু কেন তৈরি হচ্ছে তাদের কাছে? এর একটা বড় কারণ বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের "কামলা" দরকার। আমাদের মত দেশ থেকে ছাত্র এনে তারপর কিছুদিনের মধ্যে ফিল্ড ম্যানেজমেন্ট করতে ইন্ডিয়া/বাংলাদেশ কোথাও পাঠিয়ে দেবে। মাঝে আপনার প্রশংসা করবে এই বলে যে আপনার আছে কমিউনিকেশন স্কিল - ওদের সাথে নিজের ভাষায় কমিউনিকেট করতে পারবেন। হাজার হাজার ইকোনমিকসের এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে এমন - হাত ধোয়ার উপর পেপার, পাশের বাসার বন্ধুর উপর পেপার, কয়টা ছাগল কেনা হোলো তার উপর পেপার- এর আর শেষ নেই। এর উপর আরো আছে যে ওদের আমাদের কাছে এক্সপেকটেশনই কম - আমি নিজেই শুনেছি পিএইচডি ডিফেন্সে এক পাকিস্তানি ছাত্রের খুবই নিম্নমানের রিসার্চ পাশ করিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে নিজেরা কথা বলছে "ব্যাপার না, ও তো পাকিস্তানেই চলে যাবে ফেরত"।

এই সিস্টেমে ওরা অনেক ডেভেলপিং কান্ট্রি এর ছেলেমেয়ে চায় কারণ আপনি এই ডেভেলপিং কান্ট্রির প্রজেক্ট ম্যানেজ করতে পারবেন। কিন্তু এই ম্যানেজের নামে যদি পিএইচডি এর বেশিটা সময় গ্রামেগ্রামে কাটাতে হয়, সেটা তো দেশে থেকে প্রজেক্ট সুপারভাইজার হয়েই পারতাম! এরজন্য কি আমেরিকায় এসে ঘোরার দরকার ছিলো।

আমি আগে আন্ডারগ্র্যাডদের জন্য একটা ইবুক লিখেছি - এখন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য এই সিরিজটা লিখছি - মূলত এগুলোই বলার জন্য - এই "হিডেন কারিকুলাম"। এগুলো জানলে আপনি "না" বলতে শিখবেন - সেটাই আমার এক্সপেকটেশন। আমার নিজের ক্ষেত্রে আমাকে বহুবার বহু প্রলোভন দেখানো হয়েছিলো বাংলাদেশে, ইন্ডিয়াতে গিয়ে এক্সপেরিমেন্ট ম্যানেজ করতে। আমি রাজি হইনি - না হতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। আমার পিএইচডি কমিটি চেইঞ্জ করতে হয়েছে একেবারে শেষ গিয়ে। আমার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিলো এমন প্রফেসরদের চক্ষুশূল হয়েছি নিজের কাজ করতে গিয়ে। আমার নিজের রিসার্চ নিয়ে এখানে কথা বলতে চাই না প্রাসঙ্গিক না বলে- কিন্তু কি করতে চান, কি নিয়ে পিএইচডি থিসিস লিখতে চান - এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সোজা ব্যাপার না। অন্তত যেখানে আপনি জানেনও না - আসলে শেষপর্যন্ত কোনটা ওয়ার্কআউট করবে, এমন অবস্থায় অন্যের প্রজেক্টে "হ্যাঁ" বলে দেওয়া সোজা কাজ।

বিশেষত - আমাদের মত "ইয়েস বস" মানসিকতায় অন্যের প্রজেক্টে "হ্যাঁ" বলার প্রবণতা থাকে। এইজন্যই আগে থাকতে কিছু সেমিনার, কনফারেন্স এটেন্ড করা, অন্যের পেপার পড়া ভালো - চিন্তা করে দেখুন, এইসব ফান্ড-বেইজড প্রজেক্ট ভালো লাগছে নাকি অরিজিনাল আইডিয়ার কাজগুলো ভালো লাগছে! তার চেয়েও একটা বড় স্কিল বুঝতে পারা কোন পর্যায়ে গিয়ে একটা প্রজেক্টকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কতটা সময় ব্যয় করা যায় একটা নতুন আইডিয়ার পেছনে! এইগুলো সবই সোজা কথায় "এন্ট্রিপ্রিনিউশিপ" স্কিল - কিন্তু রিসার্চের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড জরুরি।

এটিটুড অনেক ক্ষেত্রেই রিসার্চারের শেষকথা। উদ্যোগী মনোভাব, কি হয় দেখি এই কিউরিওসিটি অনেক দরকার - আমরা আমাদের নিজেদের আইডিয়াকে রেস্পেক্ট না করলে, তার জন্য জানপ্রান দিয়ে চেষ্টা না করলে, অন্যরা কেন করবে? আমার জীবনে অনেক ভুল সিদ্ধান্ত আছে - কিন্তু একটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিলো আমি পিএইচডি এপ্লাই করার আগেই এই ফিল্ড ম্যানেজমেন্ট পলিটিক্সটা ধরতে পেরেছিলাম, এবং "ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকসে" এপ্লাই করিনি। তার চেয়েও ভালো সিদ্ধান্ত ছিলো বাংলাদেশি ইকোনমিকসের পিএইচডি স্টুডেন্ট আছে এমন কোথাও এপ্লাই করিনি। এগুলো আমার পারসোনাল চয়েস ছিলো - সবারই নিজের চয়েস ঠিক করে সিলেক্ট করা উচিত বলে আমি মনে করি। আপনি ঠিক করবেন কোন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া, নিজের কাজ করা - আপনার জন্য সুবিধার হবে।

পিএইচডি যতটা বলা হয়, তার চেয়ে বেশিই কঠিন জার্নি। একটা মজার তথ্য দেই - আমার পিএইচডি ডিসার্টেশন মূলত আমেরিকান ইকনমিক হিস্ট্রি এর উপর এবং এর আইডিয়াটা এসেছিলো মূলত অনেক আগে পড়া ড. মেঘনা গুহঠাকুরতার একটা পেপার থেকে - একেবারেই ভিন্ন টপিক, একেবারেই হঠাত পড়া কিন্তু কানেকশন ছিলো আমার পিএইচডি এর সাথে- এই ডটগুলো আসলে সামনে না গিয়ে বোঝা সম্ভব না। কোনো কোনো সময় তাই অনেক ডট তৈরির দিকেই নজর দিতে হয়, যাতে একসময় গিয়ে কিছু ডট মেলে। এক্সপোজারটা জরুরি। ঘাড় গুঁজে সিলেবাসের বই পড়ে এ+ পেয়ে সেটা করা কঠিন, এটাই ইবুকটাতেও বলছিলাম অনার্সের শিক্ষার্থীদের জন্য।

পর্ব ১০ঃ একাডেমিক মেন্টরিং - কিভাবে "মেন্টরড" হবেন (প্রথমে বন্দনা করি গুরুর চরণ?)

আমি ঢাকায় উদয়ন স্কুল, ভিকারুন্নিসা কলেজে পড়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স/মাস্টার্স করেছি। ছাত্রজীবনে বাংলাদেশে আমার নেটওয়ার্কের বেসিসে আমি খুব কনফিডেন্সের সাথেই বলতে চাই যে মেয়েদের "মেন্টর" থাকে না। আহমদ ছফার "যদ্যপি আমার গুরু" যদি পড়ে থাকেন, তাহলে ভাবুন বাংলাদেশে কোনো নারী স্কলার কি এই বই লিখতে পারবেন? লেখার মত মেন্টর তার থাকতে পারে? শিক্ষক/এডভাইজার ধরণের মেন্টর বাদ দিলেও সিনিয়র/সহপাঠীদের মধ্যেও একাডেমিয়া-মুখী নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধার কিছু নেই। অধ্যাপক কাবেরি গায়েন বোধহয় কথাটা বলেছিলেন, ঠিক মনে নেই কার কথা ছিলো - "বাংলাদেশে নারী একাডেমিক মানে আসলে একা"। একা না হয়ে উপায় কি?

তো, আমি ঢাবি থেকে বের হওয়ার সময় পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তেও একজনের নাম বের করতে পারিনি যাকে আমার "মেন্টর" বলা যায়। মেন্টর মানে কি? এডভাইজার কাকে বলে? তার কাছে এক্সপেকটেশন কি হওয়া উচিত? এগুলোও কিন্তু শেখার বিষয়। আপনার যদি কোনোদিন এই সম্পর্কটা নিয়েই আইডিয়া না থাকে, তাহলে প্রফেশনাল মেন্টরিং এর সম্পর্কে হঠাত ঢুকে আপনি তো খেই হারিয়ে ফেলবেন। আমার বা আমাদের অনেকের এটাই হয়েছিলো। সৌভাগ্যবশত আমার সাইমন ফ্রেজারে মাস্টার্সে এবং ইলিনয়ে পিএইচডিতে দুইজায়গাতেই আমি কাইন্ড/এম্প্যাথেটিক মানুষ পেয়েছিলাম এডভাইজার হিসেবে। তাদের ইন্টারন্যাশনাল ছাত্র - নারী শিক্ষার্থীদের সাথে কাজের এক্সপেরিয়েন্স ছিলো। আমাকে তাঁরা গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। আমার তো চ্যাটজিপিটি আসার পর এটাই প্রথম মনে হয়েছিলো যে আমার গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সময় থাকলে অন্তত ইমেইলগুলো ঠিক করে লিখতে পারতাম! একটা প্রফেশনাল ইমেইল লিখতে পারার ক্ষমতা অনেক দূর এগিয়ে দেবে ছাত্রদের - এটাই ধারণা ছিলো না।

গ্র্যাজুয়েট স্কুলের মেন্টরের মূল দায়িত্ব দেখা আপনি ঠিক সময় কোয়ালিটি বজায় রেখে পাশ করতে পারছেন কিনা। এর সাথে বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে আসে কোলাবরেশন, প্রফেশনাল একাডেমিক জার্নালে লেখার স্টাইল দেখানো, স্কিলসেট আনতে সাহায্য করা, ভুল থাকলে শোধরানো, একাডেমিক প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক বানাতে সাহায্য করা। কিন্তু মূল কাজ আপনার - গ্র্যাজুয়েট ছাত্র মানে সে একজন দায়িত্বশীল, প্রফেশনাল, প্রোএক্টিভ মানুষ। তাকে বলে দিতে হবে না বারবার কি করতে হবে। সে আন্দাজ করে দুইটা কাজ আগিয়ে নিয়ে দেখাবে যে এই আইডিয়াটা কেমন। আপনি যত বেশি আইডিয়া আনতে পারবেন টেবিলে, তত আপনার মেন্টর বুঝবেন আপনি একাডেমিক্যালি সক্ষম।

আমি আগেই বলেছি সিনেমা-উপন্যাসে দেখে এবং মা'এর বকা শুনে শেখা লাজুকলতা বাঙ্গালি মেয়ের সাথে এই প্রোএক্টিভ মানুষ যায় না। বাঙ্গালি মেয়ের আইডিয়া থাকলেও সে "পাছে লোকে কিছু বলে" বলে চুপ থাকবে। তাকে ক্রিটিসাইজ করলে সে পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে এমন মনে করবে - কারণ একাডেমিক ক্রিটিসিজম কি সেটাই তো আমাদের সিস্টেমে নেই। প্রথম কথা হচ্ছে, আপনার লেখা/রিসার্চ আর আপনি এক না। কেউ আপনার লেখা ক্রিটিসাইজ করা মানে কেবল আপনার লেখাই ক্রিটিসাইজ করছে। এবং, সত্য হচ্ছে, আপনার মধ্যে কোনো পটেনশিয়াল না থাকলে কেউ আপনাকে ক্রিটিসাইজ করবে না। মানে মানে ডিগ্রি দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দেবে। আগেও এটা বলেছিলাম।

ছাত্রদের মধ্যে তাদের জন্যই মেন্টররা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন, যাদের মধ্যে সম্ভাবনা থাকে। মনে করে যে ঘষেমেজে এটাকে মানুষ করা যাবে। ক্রিটিসিজম নিতে জানা এবং পারসোনালি না নেওয়া - একটা বড় লাইফস্কিল। হতাশ লাগবেই। কিছু করার নেই, পার্ট অফ দ্য গেইম। ক্রিটিসিজম শুনে ফেরত গিয়ে আপনি যদি আবার ঘষেমেজে আনতে পারেন, লেগে থাকতে পারেন - সেটাই দেখাবে যে আপনি লম্বা রেসের ঘোড়া। মেন্টরের কাজ আপনাকে সেই রাস্তাটাই দেখানো।

আপনার আইডিয়া যদি নাকচ করে দেয় এবং আপনার যদি মনে হয় আসলেই আইডিয়াটার ভেতর কিছু আছে - আবার লিখুন। ক্লাসমেটদের দেখতে বলুন অর্থ বোঝা যায় কিনা। লেখা পরিষ্কার কিনা। আইডিয়া নাকচ করার একটা বড় কারণ যে প্রথম দিকে আমরা খুব এলোমেলো থাকি, সেটা লেখাতেও আসে।

আর একটা কথা মাথায় রাখা ভালো যে কেউই নাই দুনিয়ায় যে সব জানে। আপনার এডভাইজার যদি সিনিয়র প্রফেসর হন, তার আধুনিক স্কিল সম্বন্ধে আইডিয়া কম হবে। আবার, জুনিয়র হলে ম্যাচিউরিটি কম হবে। এগুলো বুঝে নিজেকে তৈরি করতে হবে। ডিপার্টমেন্টে অন্য শিক্ষকদের কাছে যান, তাদের সাথেও কথা বলুন স্কিলসেট নিয়ে যদি এডভাইজার নতুন স্কিল না জানেন। এতে দোষের কিছু নেই। বরং, আমার মেন্টরকে সব জানতে হবে - এই দাবিটাই আমাদের মধ্যে থাকে, যেটা অদ্ভুত।

রিসার্চের জার্নিটাতে এডভাইজার অনেক বড় ভূমিকা রাখেন। প্রচণ্ড গুরুবাদী একটা সিস্টেম। আর ইন্টারন্যাশনাল ছাত্র হিসেবে আমরা থাকি ভালনারেবল। এর মধ্যে "যত দোষ কেষ্ট ঘোষ" এর মত এডভাইজারকে দায়ী করার প্রবণতা থাকে। আপনি এভাবে দেখুন - এডভাইজার অনেকগুলো স্টুডেন্ট এডভাইজ করেন। তার টিচিং থাকে, হাজার ঝামেলা থাকে। সবদিন আপনাকে সময় দিয়ে বোঝানো তার জন্য কঠিন। আপনি এমনভাবে ফিডব্যাক চান যেন দেওয়াটা তাঁর জন্য সোজা হয়। ধরুন, একসাথে ২০ পেইজ লেখা না পাঠিয়ে দুই/তিন করে পাঠালেন। লেখা এটাচ করে ইমেইলে বুলেট পয়েন্ট লিখে দিলেন। প্রজেক্টের জন্য ফোল্ডার শেয়ার করে সব ক্লিন করে রাখলেন।

এরপরেও ঝামেলা হবে। সব মানুষ ধৈর্য হারায়, এবং আপনি যেহেতু ছাত্র হিসেবে সিস্টেমের একেবারে নিচে - অনেককিছুই হবে যেটা ফেয়ার না। কিন্তু সিস্টেম বুঝে আপনাকেও গেইম খেলতে হবে। আপনার কাজ ভালো পেপার লেখা, পারলে জার্নালে সাবমিট করা, ঠিক সময় গ্র্যাজুয়েট হওয়া - এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে আপনার এডভাইজার আপনার একটা ইনপুট, কিন্তু একমাত্র না।

আমার এক্সপেরিয়েন্স বলে সাউথ এশিয়ান ছেলেমেয়েদের মধ্যে এডভাইজারের প্রতি অতিরিক্ত আবেগমিশ্রিত, ভয়মিশ্রিত এক্সপেকটেশনের ফলেই আমাদের অনেক ভুল হয়। এই সম্পর্কটা একটা প্রফেশনাল সম্পর্ক। অতিরিক্ত এক্সপেকটেশনে তাঁকে বিব্রত করে বা নিজের সময় নষ্ট করাটা বোকামি হবে। এমন ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় আপনি আর রিসার্চে আগ্রহ পাবেন না।

কমিউনিকেশনটা জরুরি। আপনার কাছে কিছু প্রবলেমের মনে হলে জানিয়ে দিন। বলুন যে এই প্রজেক্টটা হচ্ছে না বা এটাতে আমি বেশি ইন্টারেস্টেড। আপনি বলবেন না আপনার কি লাগবে এবং প্যাসিভ এগ্রেসিভ হয়ে এডভাইজারকে দোষ দেবেন - এটা ভীষণ অন্যায়। ও তো অন্তর্যামী না। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে মানুষের কম্পেয়ারিটিভ এডভান্টেজ বোঝা। যে যেটা ভালো পারে, তাঁকে সেটার জন্য ইউজ করুন। সবাই সব পারবে না - এটাই নিয়ম।

আর প্রফেশনালিই এপ্রিশিয়েট করুন। "আপনি ভগবান" এমন না - প্রফেশনাল একাডেমিক এর মত। ধরুন, তাঁর কোনো আগের পেপার পড়ে এসে বললেন, সেই থিওরিটা খুবই ইন্টারেস্টিং। এগুলো একাডেমিক ফ্লার্টিং আরকি! মানুষ এতে বোঝে আপনি তাঁকে ইন্টেলেকচুয়ালি এপ্রিসিয়েট করেন। যতই খারাপ লাগুক, আপনার লেখায় তাঁর এডিটিং কে রেস্পেক্ট করুন, এপ্রিসিয়েট করুন। পেপার এডিট করা অনেক সময়ের একটা কাজ। একবার পিএইচডি শেষ হয়ে গেলে কেউ আর করে দেবে না।

কাজগুলো আমাদের জন্য সোজা না, কিন্তু দেখেপড়েশুনে শিখতে হবে। এটাও গ্র্যাজুয়েট স্কুলের একটা বড় পাঠ - কারো কাছে থেকে এফেক্টিভলি ফিডব্যাক কিভাবে আদায় করবেন!

পর্ব ১১ঃ একাডেমিক নেটওয়ার্কিং - একাডেমিক সিটিজেনশিপ

জেনারেল কমিউনিকেশন নিয়ে প্রথমে কিছু কথা হচ্ছিলো - প্রবাসজীবনে প্রথমদিকে কিভাবে কমিউনিকেশনের ভীতি কাটিয়ে ওঠা যায়, কথা শুরু করা যায় ইত্যাদি আলোচনা করেছিলাম সেখানে। এবার, লিখতে চাচ্ছি একেবারেই প্রফেশনাল সেটিং এ একাডেমিক নেটওয়ার্কিং নিয়ে। বাংলাদেশে একাডেমিক নেটওয়ার্কিং শব্দটা আমাদের কালে ছিলো না। কারো কারো সাথে "স্যার"দের "ভালো" সম্পর্ক ছিলো, সেটা "একাডেমিক" ছিলো কিনা জানি না। দলাদলি ছিলো - সেটাও এক ধরণের নেটওয়ার্কিং বটে! একটা পুরুষ-ডমিনেটেড এবং চূড়ান্ত সেক্সিস্ট একাডেমিক সেটিং এ নারীদের জন্য প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা প্রায় অসম্ভব।

আমার ক্ষেত্রে দেশের বাইরে আসার আগে আমার একাডেমিক নেটওয়ার্কিং এর সাথে পরিচয় কিছুটা রিসার্চ এসিস্ট্যান্টশিপ জবের কারণে হয়েছিলো। ওইসময় আমি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করতাম, সেখানে রেগুলার সেমিনার এর আয়োজন করতেন ড. সাজ্জাদ জহির। তাতে কিছু আলোচনা হোতো। এই এক্সপেরিয়েন্সটা কাজে লেগেছিলো বুঝতে যে সেমিনার জায়গাটা শেখার জন্য একটা ভালো জায়গা। ওই সেমিনারগুলো আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগায় আমি দেশের বাইরে আসার পর সেমিনার রেগুলারলিই এটেন্ড করতাম, কেউ বলে দেয়নি।

দেশের বাইরে আসলে কি কি একাডেমিক নেটওয়ার্ক থাকবে আপনার? এক এক করে আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার ডিপার্টমেন্ট, অন্য ডিপার্টমেন্ট সব মিলিয়ে আপনার একটা অটোমেটিক একাডেমিক নেটওয়ার্ক আছে। এরা আপনার সারা জীবনের কোলাবরেটর। আমার পেপার এর কোলাবরেটর আমার গ্র্যাজুয়েট স্কুলের বন্ধু। অনেকের ক্ষেত্রেই তাই। এই নেটওয়ার্ক - আপনার শিক্ষক, অনেকেই সহপাঠী, অনেকেই আশেপাশের গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। এই নেটওয়ার্কে নিজেকে একটু এস্টাব্লিশ করতে পারলে আপনার সারা জীবনের জন্য এই নতুন গ্লোবাল একাডেমিয়ার একটা বিশ্বাসযোগ্য গ্রুপ থাকবে। গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টরা যতটা বুঝতে পারে, এই নেটওয়ার্ক তার চেয়ে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। কিন্তু সেই সুবিধাটা নিতে হলে আপনাকেও ইনভেস্ট করতে হবে কমিউনিটিতে। নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। তার চেয়ে বড় কথা ডিপার্টমেন্টে রেগুলার আসতে হবে। ডিপার্টমেন্টে রেগুলার মূলত পুরুষ ছাত্ররা আসে বলে পুরুষ ছাত্রদের মধ্যে লং-টার্ম কোলাবরেশন আমি বেশি দেখেছি।

ডিপার্টমেন্টের ভেতরে আপনার সহপাঠীরা আপনার লং-টার্মে রিসার্চ কোলাবরেটর হতে পারে। আপনার পেপারে তাদের অনেক ভূমিকা থাকবে, আপনারও অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে তাদের ফিডব্যাক দেওয়ার। কমিউনিটি মেম্বার হিসেবে রিসার্চে সেমিনার এটেন্ড করাটাও খুব দরকার। আমি রিসার্চ সেমিনার অর্গানাইজ করেছি অনেকদিন, করে দেখেছি যে অনেকেই আসতে চান না রেগুলার। যারা নিয়মিত আসেন, তাদের আলাদাভাবেই রিসার্চার হিসেবে মানুষ রেস্পেক্ট করে। মনে করে এরা আগ্রহী মানুষ।

ইউনিভার্সিটিতে কাছাকাছি বিষয়ের অন্য ডিপার্টমেন্টের ছাত্র/শিক্ষক যাদের সাথে ইন্টারেস্ট মেলে, তাদের সাথেও কোলাবরেট করার অনেক সম্ভাবনা আজকের ইন্টারডিসিপ্লিনারি যুগে। আমি যেমন ন্যাচারাল রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের সাথে ভালো যোগাযোগ রাখতাম। সেমিনারে রেগুলার যাওয়াটা রিসার্চে ইন্টারেস্টেড মানুষের সাথে পরিচয়ের সবচেয়ে সহজ, লো কস্ট উপায়। বাইরে থেকে আসা সেমিনার স্পিকারদের সাথে কথা বলা, স্পিকারদের সাথে মিটিং এটেন্ড করাটা লং-টার্মে অনেক সাহায্য করে। এরকম স্পিকার আসলে সাধারণত ডিনারও অর্গানাইজ করা হয় - এগুলো এটেন্ড করা, জব টক এটেন্ড করা - এসব অনেক লং-টার্মে কাজ করে। কারণ, এগুলোর মাধ্যমে মানুষ আপনাকে চেনে। আপনার রিসার্চ টপিক নিয়ে জানে।

শিক্ষকদের কাছে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করার আর একটা উপায় হোলো প্রস্পেক্টিভ স্টুডেন্ট ডে তে যাওয়া। আপনার এই ছোটোখাটো সাহায্যগুলো মানুষ অনেক মনে রাখে। বোঝে যে আপনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে জানেন। এইধরনের সফট স্কিলের একাডেমিয়ায় অনেক ভূমিকা কারণ এখানে অনেক কাজই আসলে ভলান্টিয়ারিং।

ডিপার্ট্মেন্টের বাইরে এরপর কথা বলতে চাই কনফারেন্স নিয়ে। বড় কনফারেন্সে নিজে প্রেজেন্ট এর আগে আমার কাছে মনে হয় একটা কনফারেন্স কেবল এটেন্ড করার জন্যই যাওয়া উচিত। হয়তো এইজন্য কেউ ফান্ডিং দেবে না, কিন্তু আমি মনে করি এটা একটা ভালো ইনভেস্টমেন্ট।

কনফারেন্সে গেলে কিভাবে কথা বলবেন? আমি আসলে এখন একটা কনফারেন্সে আছি নিউ ইয়র্কে। এখানে গতকাল এক এশিয়ান নারীর সাথে পরিচয় হোলো যিনি মূলত ঘুরে ঘুরে সব নারীর কাছেই তাদের বয়স জানতে চাইছেন। আমার বিয়ে, বাচ্চা, হাজব্যান্ড আছে কিনা ইত্যাদি পারসোনাল প্রশ্ন করলেন। আমি বুঝতে পারি কালচারাল প্রশ্নগুলো, মাথায় থাকা ওল্ড কনভার্সেশন আইডিয়াগুলো। কিন্তু এটাও বুঝতে হবে যে এই জায়গা থেকে বের না হতে পারাটা চরম ভুল। আপনার সাথে যদি কারো কথা বলতেই "বিরক্ত" লাগে, তাহলে সেই কনফারেন্স তো কাজে লাগবে না। সুতরাং, প্রথম পয়েন্ট - পারসোনাল কোনো প্রশ্ন না করা। কেউ আপনাকে প্রশ্ন করলেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

কনভার্সেশন শেষ করে দেওয়া। আপনার কাজ অন্য এশিয়ান নারীদের সাথে "খাতির" পাতানো না, কনফারেন্সে আপনার কাজ আপনার ফিল্ডে যারা ভালো কাজ করেন, তাদের কাছে নিজের পটেনশিয়াল প্রমাণ করা। এটা ফোকাসে রাখুন। "বান্ধবী" বের করতে পারলে ইনিশিয়াল কিছু ইম্মিডিয়েট স্যাটিস্ফেকশন আসতে পারে, কিন্তু এটা কনফারেন্সে যাওয়ার বেস্ট ইউটিলাইজেশন না। নারী সহকর্মীদের সাথে পারসোনাল কথার বাইরে প্রফেশনাল কথা, রিসার্চের কথা বলার অভ্যাস করা আমাদের সবারই দরকার। এটা আসলেই খুব কম দেখি।

কোল্ড ইমেইল করাটা ভালো অভ্যাস কনফারেন্সের আগে - শর্ট মিটিং এর জন্য রিকোয়েস্ট করে। যেমন, ধরুন, আপনার ফিল্ডের কারো সাথে কথা বলতে চান। আগে থেকেই ইমেইল করে একটা কফি মিটিং সেট করে রাখতে পারেন। এক কনফারেন্সে এমন ৩/৪ জন টার্গেট করে রাখলে আপনার প্রফেশনাল একাডেমিক মিটিং এর এক্সপেরিয়েন্সও হবে। কারো টক ভালো লাগলে ইমেইল করে জানানোটা ভালো প্র্যাকটিস। কনফারেন্সের পরে যাদের সাথে কথা হোলো, তাদের ইমেইল পাঠালে তাঁরা আপনার নাম মনে রাখবে। আমি পারসোনাল কার্ড ১০০ এর মত ছাপিয়ে রাখাটাও কাজে লাগতে পারে বলে মনে করি। আপনার টার্গেট মানুষের মেমোরিতে আপনার কাজ রেখে দেওয়া - এটা করার জন্য যা দরকার সবই করুন।

সেমিনার, ডিপার্টমেন্ট, ইউনিভার্সিটি, কনফারেন্স - এইগুলোই আসলে মেইন স্থান একাডেমিক কোলাবরেশনের। কয়েকবার গেলে পরেই নিজেকে ফ্লো তে ঢুকিয়ে ফেলা যায়। শুধুমাত্র শুরু করাটা, নিজেকে প্রফেশনালি প্রিপেয়ার রাখাটাই প্রথমে দরকারি।

শেষ করছি দুইটা জরুরি নোট দিয়ে -

১) প্রফেশনাল কাজে ফেসবুক ব্যবহার করার আমি পক্ষে না। একটা ইমেইল করা এমন কিছু কঠিন কাজ না- বিশেষত একাডেমিয়ায়, যেখানে সবার ইমেইল আইডি পাবলিকলি এভেইলেবল। আমি বারবারই কথাটা বলি, বাংলাদেশের অনেক ছাত্র-শিক্ষক খুব বেশি ফেসবুক ডিপেন্ডেন্ড। যে কথাটা দুই লাইনে ইমেইলে হয়, সেটার জন্য ফেসবুক ব্যবহার করা ঠিক না বলে আমার মনে হয়। মানুষকে নক করে তারপর "আপু আমার ফোনটা ধরে আসি, ১০ মিনিট দাঁড়ান" - এটাও আমার অভিজ্ঞতায় আছে। অপরিচিত মানুষকে লিংকেডিনে এড করা যায় প্রফেশনাল কারণে, কিন্তু ফেসবুকে না। ইদানিং আবার অনেকে নিজের ফেসবুক লক করে তারপর এড করেন, জানি না এগুলো কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় - তবে, আমার মতে এগুলো কাজের অভ্যাস না।

ধরুন, আপনার কাছে আমার একটা পেপার এর রেফারেন্স দরকার, আমি ইমেইল করলাম - আপনি উত্তর দিলেন। ২ মিনিটে কাজ শেষ। কিন্তু অন্যদিকে আমি আপনাকে ফেসবুকে নক করলাম, আপনার অনেকটা সময় গেলো কনভার্সেশনে, কিংবা এড করলাম আপনার আরো ডিটেইল জানার জন্য। আমাকে কেন জানতে হবে আপনার প্রতিদিনের কথা? এটা তো কাজের অভ্যাস না। ফেসবুকের সাথে লিংকেডিনের পার্থক্য বোঝাটা খুব দরকার গ্লোবাল একাডেমিয়ায় গেলে। আপনার প্রতিদিনের জীবনযাপনে নাক গলানো আমার উচিত না। যে কাজটা ইমেইলে করা যায়, সেটা ইমেইলেই করাটা আমাদের শেখা দরকার।

২) নারীদের সাথে প্রফেশনাল ব্যবহার - দুঃখজনক কিন্তু সত্য হচ্ছে, আমি এশিয়ান নারীদের মধ্যে অন্য নারীদের সাথে প্রফেশনাল ব্যবহার না করার এই প্রবণতা খুব বেশি দেখি।

আমার সাথে কনফারেন্সে ধরুন আমার মত দেখতে (সাউথ এশিয়ান) এক নারীর পরিচয় হোলো। তাকে ঠিক ততটাই প্রফেশনাল রেস্পেক্ট দেওয়া উচিত যতটা তাঁর জায়গায় একজন পুরুষ থাকলে দিতাম, না? ইনফরম্যাল সম্পর্ক আর প্রফেশনাল সম্পর্ক এর পার্থক্য বুঝতে পারা একাডেমিয়ায় টিকে থাকার অন্যতম দরকারি জিনিস। নারী একাডেমিকদের দায়িত্ব আমার ইমোশনাল ট্রমা নিয়ে ডিল করা না, এগুলোকে ইমোশনাল বার্ডেন চাপিয়ে দেওয়া বলে। সেই পুরোনো সিনিয়র নারী মানেই "আপ্পি" "মামী/চাচী" ধরণের - কারণ ছেলেমেয়ে সবাইই পুরুষ প্রফেশনালদের ভয় করেন, রেস্পেক্ট করেন। এবং, নারী প্রফেশনালদের পাশের বাসার আপু, আন্টি মনে করেন। প্রতিবার কনফারেন্সেই এমন কিছু আশেপাশে আচরণ দেখি যেটা আমার ধারনা বন্ধ করাটা খুব দরকার। আমরা নিজেরা প্র্যাকটিস শুরু করে, নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে শিখিয়েও কিছুটা কালচার পরিবর্তন করতে পারি।

এগুলো থেকে দূরে থাকলে আমরা সহজেই সিগন্যাল করতে পারি যে আমরা একাডেমিক প্রফেশনালিজম জানি। প্রফেশনালিজম জানাটা একাডেমিয়ায় কতটা দরকারি - এটা কাজে না নামলে বোঝা যায় না।

পর্ব ১২ (শেষ পর্ব): Listen to your gut feeling ("আমি অভয় মনে ছাড়বো তরী, এই শুধু মোর দায়")

"এডভাইস ট্র্যাপ" বলতে একটা শব্দ আছে। এটা মাথায় রাখা প্রচণ্ড দরকার - বিশেষ করে আমাদের মত সমাজে। এবং, আরো বিশেষ করে যারা একাডেমিয়ার মত লম্বা দৌড়ে নামতে চায়, তাদের জন্য কোথায় থামতে হবে এটা জানার চেয়ে বড় স্কিল নেই। উপদেশ দেওয়ার লোকের কোনো দেশে কোনো সময় অভাব হয় না, মানুষ কনটেক্সট না বুঝেই উপদেশ দেওয়া শুরু করে। নিজে থেকে এসে আমার কিভাবে পেপার লেখা উচিত, কিভাবে দেশের বাম রাজনীতির সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত, ওয়েবিনারে মুখ দেখানো উচিত এই ধরণের উপদেশ দিয়েছেন অনেক মানুষ যারা নিজেরা একাডেমিয়াতে নেই। আবার, পিএইচডি করে রিসার্চ ছেড়ে দিয়েছেন এমন অনেকে উপদেশ দিয়েছেন আমিও যেন ছেড়ে দেই। আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ এডভাইসগুলো - সংকোচের সাথে শেয়ার করি যে আমি দেশী (ব্রাউন) নারীদের কাছে থেকে পেয়েছি। আবার, স্যোশাল আপব্রিঙ্গিং এর কারণেই হোক বা অন্য কারণে হোক - অনেক নারীই অন্যের উপদেশের উপর বেশি নির্ভর করেন নিজের Gut Feeling এর চেয়ে। মানুষ বোঝে না যে পরে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যাবে না ব্লেইম করার জন্য। তাই সিদ্ধান্ত নিজে নিয়ে পস্তানো অনেক বেশি ভালো। তার চেয়েও ভালো Stoic নীতি মেনে চলা - সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর যেটা আনকন্ট্রোলেবল সেটা নিয়ে চিন্তাই না করা। বিশেষত, আমাদের দেশে মেয়েদের উপদেশ দেওয়ার লোকের তো অভাবই হয় না। এডভাইস দেওয়া এবং নেওয়া দুই ক্ষেত্রেই সচেতন থাকা তাই দরকার।

তো, কথা বলতে চাইছি শেষ পর্বে একটু ফিলোসফিক্যাল, একটু লং-টার্ম ভিশন নিয়ে। সবাই উপদেশ দেবেই, কিন্তু নিজের সাথে বোঝাপড়াটা সবচেয়ে বেশি দরকার। রিসার্চ লাইনে, একাডেমিক জীবনে টাকা কম, কাজ বেশি, চাপের শেষ নেই - এত কি নেওয়া সম্ভব অন্যের "এডভাইসে" জীবন চালিয়ে? এককেটা রিসার্চ প্রজেক্ট আগাগোড়া ফেল করতে পারে মাসের পর মাস খাটনির পর - সেটা কি অন্যের সিদ্ধান্তে চলে মানা সম্ভব? এ এইটা বলছে, ও ওইটা বলছে - ধরণের কমপ্লেইন দুই/একবারের বেশি কেউ শুনবে না। শুনলেও কাজে লাগবে না।

তাই শেষ কথা এটাই - ট্রাস্ট ইউর গাট ফিলিং। ক্যাল্কুলেটেড রিস্ক নেওয়া জীবনের খুব বড় একটা স্কিল। একটু একটু করে চেষ্টা করেই এই ক্ষমতা আনতে হয়।

হ্যাঁ, এই রিস্ক নেওয়ার ক্ষমতা আনতে আমাদের কষ্ট হয়। হওয়াই স্বাভাবিক, আমাদের মত বন্ধ সমাজে গৎবাঁধা চক্রে বড় হওয়া মেয়েদের জন্য বেশি কঠিন নিজের উপর নির্ভর করা। গাট ফিলিং ফলো করে আপনি জিতবেন না হারবেন আমি জানি না, কিন্তু অন্তত জীবনের হারজিতের বার্ডেন নিজেই নিতে শিখবেন। একটা কথা আছে -

Connect the dots. কানেক্ট দ্য ডটস তখনই কিন্তু করা সম্ভব যখন আপনার অনেক ডটস থাকে মানে আপনি অনেক স্টেপ নেবেন, কিছু কাজে লাগবে, কিছু লাগবে না - এবং, ভবিষ্যতে তার কিছু ডটস কানেক্টেড হবে। ডটস-ই যদি না থাকে, রিস্কই যদি না নিয়ে থাকেন - তাহলে আর কানেক্ট করবেন কেমন করে!

আমি ভাবছিলাম এটা নিয়ে কিভাবে উদাহরণ দেবো। তাই আমি আমার প্রবাসজীবনের প্রথম কয়েকটা "গাট ফিলিং" সিদ্ধান্তের কথা বলবো - যেগুলো আজকে বুঝি অনেক হেল্প করেছে। ঐসময় সিদ্ধান্ত ঐভাবে নিয়েছিলাম কন্টেক্সটের জন্য, গাট ফিলিং এ ভর করে, যা হয় হবে ভেবে। আমার যেহেতু মেন্টর ছিলো না দেশে থাকতে, আমি এগুলো একাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ২০১০ - ২০১৩ সময়কালের কথা বলছি, তখন এত ফেসবুক - ইউটিউব ইত্যাদিও এই আকারে ছিলো না।

প্রথমত, ঢাবি থেকে বের হওয়ার আগেই জিআরই প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করা, বের হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই পরীক্ষা দেওয়া এবং দেশে চাকরি না নেওয়া। এই সিদ্ধান্ত আমার নিজের ক্ষেত্রে অনেক ভালো ছিলো। এর চেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত আমি সারাজীবনে আর নেইনি। সিদ্ধান্তটা আসলে পুরোই কন্টেক্সট ভিত্তিক। আমার কাছে মনে হয়েছিলো ঢাবি থেকে বের হয়ে দেশে থাকলে আমি কিছু করতে পারবো না। আরেকটা ভালো সিদ্ধান্ত ছিলো - পিএইচডি তে ডাইরেক্ট এপ্লাই না করা - জিআরই ম্যাথে ফুল স্কোর পাওয়া সত্ত্বেও আমি ডাইরেক্ট পিএইচডিতে এপ্লাই করিনি। এতে ঝামেলা হয়েছে, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি বাইরে গিয়ে মাস্টার্সের সময়টায় আদৌ রিসার্চ করতে চাই কিনা। একেবারেই রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স ছাড়া, একাডেমিক এক্সপোজার ছাড়া পিএইচডি শুরু করলে আমি হয়তো বুঝতাম না। একাডেমিক কালচার কেমন, তা আমার ভালো লাগে কিনা - এটা বুঝতে সাহায্য করেছে মাস্টার্স। দেশের বাইরে পড়ার জন্যই আসতে চাইলেও এই একাডেমিক

জীবন মানে কি - না এসে বুঝতাম না।

এরপর আরো একটা ভালো সিদ্ধান্ত ছিলো যেখানে ফুল ফান্ডিং পেয়েছি সেখানে যাওয়া - একবারের জন্য কোনো কিছুতে ফুল ফান্ডিং ছাড়া যাইনি। আমি বাড়িতে টাকা চাইনি কখনো, আমার কাছে মনে হয়নি এটা একটা অপশন। মূলত আমি ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে চাইছিলাম। ফুল ফান্ডিং আমাকে সেই পথটা দিয়েছিলো। দেশে থাকলে আসলে এটাও পারতাম না।

পিএইচডি স্কুল সিলেকশনে রিসার্চ, একাডেমিয়া বাদ দিয়ে আমি কয়েকটা ব্যাপার মাথায় রেখেছিলাম। এগুলোও লং-টার্মে সাহায্য করেছে। যেমন, ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্স ফিল্ডে পিএইচডি করতে না যাওয়া - আমি দেশে থাকতে কিছুদিন মাইক্রোফাইন্যান্সের কাজ করেছিলাম, সাইমন ফ্রেজারে মাস্টার্সের প্রজেক্টও এই টপিকে ছিলো (এক সেমিস্টারের ছোটো প্রজেক্ট করেছিলাম)। ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সে কাজ করতে চাইনি বলে আমি এমন জায়গায় পিএইচডিতে গিয়েছিলাম যেখানে আমি পুরোটাই একাডেমিক কাজে দিতে পেরেছি। এই দেশ, ওই দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়নি। এডমিনিস্ট্রেটিভ ফিল্ড কাজ করতে হয়নি।

আর - বাংলাদেশি গসিপ থেকে দূরে থাকতে ব্যবস্থা নেওয়া যা যতদূর সম্ভব, সবই নিয়েছিলাম - আমি পিএইচডিতে এপ্লাই করার সময় এমন কোথাও করিনি যেখানে আমার বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের সাথে দেখা হবে। আমি একেবারে ওয়ান টু ওয়ান চেক করে যেখানে একেবারেই বাংলাদেশি ইকোনমিকসের ছাত্র নেই, সেখানে গিয়েছিলাম। আমার নিজের মানসিক শান্তির জন্য এটা খুব দরকার ছিলো। অন্যতম একটা ভালো সিদ্ধান্ত এটাও ছিলো। আমি নিজের মত করে নতুনভাবে কমিউনিটি তৈরি করতে পেরেছি, কে কি বললো - বুলিয়িং করলো - এই চিন্তা করতে হয়নি।

আমার মাস্টার্স শেষ হয় ২০১৩ এর জানুয়ারিতে। পিএইচডি শুরু করি ওই বছর আগস্টে। আমি ২০১৩ এপ্রিল পর্যন্ত টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপের কাজে ভ্যাংকুভারে ছিলাম। এই চার মাস আমি প্রচুর হিস্ট্রি বই পড়েছিলাম সাইমন ফ্রেজার লাইব্রেরি থেকে নিয়ে। শ খানেক বই ঘেঁটেছি ওই সময় ল্যান্ড - হিস্ট্রি এইসব নিয়ে। সিলেবাস ছাড়া ফ্রি স্টাইলে পড়ে যাওয়া। এই সময়ের গড়ে ওঠা ল্যান্ড-হিস্ট্রি নিয়ে ইন্টারেস্টটা পরে আমার ডিসার্টেশনের টপিকে অনেক সাহায্য করেছে। তখন কেবল জানার আগ্রহ থেকেই করছিলাম। কিন্তু আমার সামগ্রিক চিন্তাধারায় ওই সময়টার অনেক বড় প্রভাব পড়েছে। কোথায় কি কাজে লাগে, কিভাবে ডটস কানেক্ট হয় - কোন কাজ র‍্যান্ডমলি কোথায় কানেক্টেড

হবে, আসলে আমরা জানি না। তাই বেশি করে নিজেকে এক্সপোজ করা, বিভিন্ন দিকে চেষ্টা করা, পড়াশোনার অভ্যাস রাখাটা একাডেমিয়ায় এত দরকারি।

তো, এটাই - অন্য সবার এডভাইস নিলেও শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে হয়। এবং, তার চেয়েও বড় কথা সেই সিদ্ধান্তের কনসেকুয়েন্স নেওয়ার মত সাহস থাকতে হয়। এটাই নিজের কাছে নিজের একাউন্টেবিলিটি। আমি ছাড়া অন্য সবার সব দোষ - আমার জীবনে যা যা হয়নি সব কিছুর পেছনে অন্যরা দায়ী - এই বাঙ্গালি "ঘ্যানঘ্যান" থেকে আমি আন্তরিকভাবে চাই মেয়েরা বের হয়ে আসুক।

Thank you for reading, Happy Learning!